গৃহের ব্যবস্থা যে ভারতীয়দিগের অপেক্ষা অন্যরূপ—এটা আমরা ভাবিয়া দেখি না। ফলে যে সব সংসারে সেঁকতাপ গ্রহণের ব্যবস্থা এখনও উঠিয়া যায় নাই, সে সব সংসারে শিশুমৃত্যুর পরিমাণ অনেকটা কম বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শিশু মৃত্যুর আরও কারণ।—ভারতে বিশুদ্ধ গো দুগ্ধের অভাব শিশু-মৃত্যুর আর একটি কারণ। ভারতবাসী আগের মত এখন আর দুগ্ধপ্রিয় নহেন, শিশুপালন সম্বন্ধেও অনেক স্থলে ভারতবাসী এখন অনেকটা সেই ব্যবস্থা পালন করিয়া থাকেন। বিলাতী জমাট দুগ্ধ, মেলিন্সফুড প্রভৃতি এখন অনেক শিশুরই প্রধান খাদ্য। এই খাদ্যে শিশুর প্রাণ রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। আগে গাভীপালন ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল, তখন গাভী দুগ্ধের অভাব ছিল না, ভারতে শিশুমৃত্যুর আধিক্যও তখন এরূপ ছিল না। আমেরিকাবাসী এখন একথা বুঝিয়াছেন, আমেরিকায় গো পালন সম্বন্ধে বহু বিদ্যালয় আছে, সেইজন্য আমেরিকায় শিশুমৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও কম।

শিশুমৃত্যুর আরও কারণ নির্দ্দেশ।—শিশুমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অপরিণত বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা। কিন্তু সমাজের গতিস্রোতে এ ব্যবস্থা রুদ্ধ করিবার যো নাই। শিশু মৃত্যুর হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে যত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এমন আর কোনো দেশে নহে। বাঙ্গালী সমাজ যেরূপ কন্যাদায় পীড়িত—তাহার ফলে উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর মিলন হওয়া প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বি-এ, এম-এ, বি-এস, সি, এম-এস, সি পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু পাত্র স্বাস্থ্যবান কি না, বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠের পীড়নে আয়ুষ্কাল স্বল্প ভোগের কারণ করিয়া তুলিয়াছেন কি না এবং তাঁহার স্বাস্থ্যহীন দেহে যে সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবি হইবে কি না—এ সকল বিষয় বিচার করিবার অবসর পাইলেন না। ফলে বাঙ্গালী সমাজে এখনকার দিনে অনেক ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী পুরুষের মিলন সংঘটিত হয়—তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া দেখিলে উপযুক্ত হয় না। কাজেই দুর্ব্বল পিতৃবীর্য্যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি সন্তান লাভের আশা কেমন করিয়া যায়? সকল দেশ অপেক্ষা বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যুর আধিক্যও এইজন্য।

কলিকাতায় বসন্ত।—কলিকাতায় বসন্ত রোগ প্রবল ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতি সপ্তাহেই এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সহর বাসীর এ সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর ঘোষণা।—কলিকাতার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী এই বসন্ত রোগ সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন যে,—"এইবার এই রোগে মহামারী হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সহরের উত্তরাংশেই এখন ইহার প্রকোপ দেখা যাইতেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এই মহামারী ১৯১৫ সালের মহামারী হইতেও ভীষণতর হইবে।"

স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর আরও বক্তব্য।

—বসন্ত সম্বন্ধে স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—"১৯১৫ সালে কলিকাতা সহরের দশ হাজার ব্যক্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়, উহাদের মধ্যে আড়াই হাজার লোক মারা গিয়াছিল। এবার যদি সেই বৎসরের মতই ইহা ভীষণ ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইবে এবং উহাদের মধ্যে সামান্য সংখক লোকই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থান পাইবে। এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সহর-বাসীর সকলেই টীকা গ্রহণ করুন। যাঁহারা একবার টীকা গ্রহণ করিয়াছেন,তাঁহারাও পুনরায় টীকা গ্রহণ করুন। টীকা লইবার পরে ক্রমশঃ উহার শক্তি কমিয়া আসে, এজন্য যাঁহারা ৫ বৎসর পূর্ব্বে টীকা লইয়াছেন, তাঁহারা আবার অবশ্য টীকা গ্রহণ করিবেন।" স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয়ের প্রস্তাবমত সকলেরই টীকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞানকংগ্রেস।—সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নাগপুরে বিজ্ঞান-কংগ্রেস আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে শতাধিক বৈজ্ঞানিকপ্রবন্ধ পঠিত হইবার কথা।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধ।—ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধের উপায় নির্ণয়ের জন্য গত ১৯১৯ সালে পারিস সহরের চিকিৎসক গণের সম্মিলনে এক মহা সভার অধিবেশন হয়, কিন্তু সে অধিবেশনে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, এই ব্যাধি সম্বন্ধে প্রয়োজন মত তথ্য সকল পাওয়া যাইতেছে না। ইহার এক বৎসর পরে এখন নাকি সেখানকার চিকিৎসকগণ গবেষণা করিবার অবসর পাইয়াছেন। সেই জন্য স্থির হইয়াছে, শীঘ্রই আর একটী মহা সভার অধিবেশন হইবে এবং সে অধিবেশনে ভারতবর্ষ হইতেও প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিবে।

সম্পাদক-কবিরাজ।—আমরা এক জন সাহিত্য সেবীকে এত দিন সংবাদ পত্রের সম্পাদক রূপেই দেখিয়া আসিতেছিলাম, সংপ্রতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিতেছি, তিনি কবিরাজী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। শুভ!

সহরে মৃত্যুর হিসাব।—গত ১০ই জানুয়ারি যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে মোট ৮৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে বসন্তে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঐ সপ্তাহে বসন্তে মরিয়াছে ১২৪ জন।

নোয়াখালিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা।—নোয়াখালির সংবাদ পত্রে প্রকাশ, নোয়াখালি জেলার অনেক স্থানেই নাকি বহু লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিতেছে। বাঙ্গালা দেশ ক্রমে সকল রোগের আকর ভূমি হইতে চলিল।

শোক সংবাদ।—ভট্টপল্লীর অলঙ্কার, বরণীয় অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বেদের পরম-ভক্ত মহাত্মা ৺শিবচন্দ্র সার্ব্ব ভৌম মহাশয় গত ২রা পৌষ বেলা ৮ টার সময়, সান্ধ্যাহ্নিক করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। অতি সুন্দর, অতি বাঞ্ছনীয় মরণ! এতদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রাচীন ধারা শুকাইয়া গেল। ইনি জীবনে কখনও ডাক্তারী ঔষধ সেবন করেন নাই। চির দিন আয়ুর্ব্বেদের উপাসক ছিলেন।

IMPERIAL

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

—:*:—

[শারীর পরিচয়]

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল,এম,এস)

শারীর ও মানস উভয়বিধ রোগ প্রধানতঃ শরীরকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয় এবং উভয়বিধ রোগে শরীরই চিকিৎসার প্রধান ক্ষেত্র। সুতরাং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে শরীরের উপাদান, গঠন প্রণালী, শরীরস্থ বিবিধ যন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি এবং ক্রিয়াদির বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। একটি ঘড়ি মেরামত করিতে হইলে যেমন ঘড়ি কি উপায়ে চলে, উহাতে কিরূপ কতগুলি চাকা আছে, কোন্ চাকা কাহার সহিত সংলগ্ন, কোন্ চাকা কিরূপে কোন্ দিকে কার্য্য করে, কি কারণে ঘড়ি দ্রুতভাবে বা মন্দভাবে চলে—ইত্যাদি সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ শরীরের চিকিৎসা করিতে হইলে শরীরের গঠন ও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। ঘড়ির সমস্ত সূক্ষ্ম অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে যেমন তাহার যেখানে যে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং বুঝিয়া আবশ্যক মত মেরামত করিতে পারা যায়, সেইরূপ শরীরের সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অসুস্থ শরীরে কোথায় কি বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে পারা যায়।

প্রাণিমাত্রেরই প্রাণ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। শরীর ও শারীরিক যন্ত্রাদির সহিত প্রাণের আধার আধেয় সম্বন্ধ। উহাদের উৎকর্ষ, স্বাভাবিক ক্রিয়া

এবং অপকর্ষ বা ক্রিয়াবৈষম্য যথাক্রমে দীর্ঘ আয়ু, মধ্যম আয়ু এবং অল্প আয়ুর কারণ হইয়া থাকে। চরক-সংহিতায় কথিত হইয়াছেঃ— "শরীরবিচয় অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শরীরের হিতের জন্য চিকিৎসকের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য—ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গ। কারণ, শরীর-তত্ত্বে জ্ঞান জন্মিলে শরীরের কিসে হিত হয়, সে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। এই জন্য পণ্ডিতগণ শারীর-বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকেন"। * সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা এবং দীর্ঘায়ু লাভের উপায় জানিতে হইলে শারীর-তত্ত্ব শিক্ষা করা অতীব আবশ্যক।

শারীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দুই প্রকার—যথা, বাহ্য উপায়লব্ধ জ্ঞান ও আভ্যন্তর উপায়লব্ধ জ্ঞান। তন্মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশেষতঃ চক্ষু দ্বারা (কোন কোন স্থলে অনুবিক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে) জীবিত এবং মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে বাহ্য উপায়লব্ধ জ্ঞান বা বাহ্য জ্ঞান বলে। আর দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষিগণ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা যে শারীর তত্ত্ব বিষয়ক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করেন, তাহাকে আভ্যন্তর উপায়লব্ধ জ্ঞান বা আভ্যন্তর জ্ঞান বলে। কেবল যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণই আভ্যন্তর জ্ঞান লাভের অধিকারী। অতএব আমরা বাহ্যজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই শারীর তত্ত্বের বর্ণনা করিব।

কিরূপে মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া শারীর তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে সুশ্রুতসংহিতায় নিম্নলিখিত উপদেশ আছেঃ—

"সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অর্থাৎ যাহা অঙ্গহীন নহে, যাহা বিষের দ্বারা মৃত নহে, যাহা দীর্ঘকাল ব্যাধি পীড়িত নহে, এবং যাহার একশত বৎসর বয়স (অর্থাৎ বিশেষ বার্দ্ধক্য) হয় নাই, এইরূপ মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া অন্ত্র ও পুরীষ নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিবে। পরে উহা মুঞ্জ, তৃণ, বল্কল, কুশ বা শণের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পঞ্জরের (বড় খাঁচার) মধ্যে রাখিয়া অপ্রকাশ্য স্থানে স্রোতোহীন নদীর জলে পচাইবে। সাত দিন পরে উত্তমরূপে পচিলে সেই দেহ উদ্ধৃত করিয়া বেণার মূল, চুল, বাঁশ বা গাছের ছালের কুঁচি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে এবং চর্ম্মাদি সমস্ত বাহ্য বা আভ্যন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ চক্ষু দ্বারা উত্তমরূপে দেখিবে'। †

শরীরের ছয়টি অঙ্গ প্রধান বলিয়া শরীরকে ষড়ঙ্গ বলা যায়। ছয়টী অঙ্গ যথা,—দুই বাহু, দুই সক্থি (দু'খানি পা), মধ্যশরীর এবং মস্তক। দুইবাহু এবং দুই সক্থিকেআয়ুর্ব্বেদে চারিটী শাখা বলা হয়।

---

* 'শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগবিদ্যেয়ম্। জ্ঞাতে হি শরীরতত্ত্বে শরীরোপকারকেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।' চরক শারীরস্থান ৬ অধ্যায়।

† "তস্মাৎ সমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমহরন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থংমুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যকপ্রকুথিতক্কোদ্ধৃত্য দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণুবল্কলকুর্চ্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরব ঘর্ষয়ংস্তগাদীন সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষেতি। সুশ্রুত শারীর স্থান ৬ অধ্যায়। বলা বাহুল্য এই প্রণালী বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। ইদানীং পচনক্রিয়ানিবারক ঔষধাদি সংযোগে মৃত শরীর সুরক্ষিত করিয়া পরীক্ষা করা হয়। সত্য বটে শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক অংশ দেহ পচাইয়া দেখিলে সহজে দেখা যাইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নিপুণতার সহিত সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ করিয়াও সে সকল দেখা যায়।

দুইটী বাহুদ্বারা গ্রহণধারণাদি কার্য্য এবং দুইটি সক্‌থি দ্বারা গমন ও শরীরের ধারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মধ্যশরীরে—রক্তসঞ্চালন, শ্বাস গ্রহণ, অন্নপরিপাক, মলমূত্র বিসর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যকর আশয় বা যন্ত্র সমূহ অবস্থিতি করে। বৃক্ষের কাণ্ড যেমন মূল ও শাখা সমূহের আশ্রয় স্বরূপ, মধ্যশরীরও সেইরূপ চারিটি শাখা ও মস্তকের আশ্রয় স্বরূপ। মস্তকে শ্বাস গ্রহণের দ্বার নাসা, মুখ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ অবস্থিতি করে। সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টাবহ নাড়ী সকলের মূল এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তিষ্কও মস্তকের মধ্যেই অবস্থিত। জ্ঞানের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তিষ্ক মস্তকের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উহা উত্তমাঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে। ষড়ঙ্গ শরীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে বীজরূপে প্রদত্ত হইল। পরে ইহাই বিস্তৃতভাবে লিখিত হইবে।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ * যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

"যে চিকিৎসক সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সমগ্র শরীরের তত্ত্ব সমূহ অবগত আছেন, তিনিই সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ বুঝিতে সক্ষম।" (চরক)

"শাস্ত্রলিখিত শারীরতত্ত্ব পাঠ করিয়া এবং স্বচক্ষে সমগ্র শরীরতত্ত্ব দর্শন করিয়া শারীর-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবে। প্রত্যক্ষ দর্শন এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সন্দেহ দূর করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। চক্ষুঃ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখা এবং শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অবগত হওয়া—এই উভয়ের সমন্বয় ঘটিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে।" (সুশ্রুত)

শারীর পরিভাষা।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই শারীর পরিভাষা অর্থাৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এবং শরীরের উপাদান সমূহের শাস্ত্রীয় নাম অবগত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্তসংস্কার থাকায় নানারূপ গোলযোগ হইতে পারে। সেইজন্য প্রথমেই শারীরপরিভাষা লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শরীরের প্রধান অঙ্গ ছয়টী। এক্ষণে উহাদের অবয়ব সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে। বাহুর সহিত মধ্য-শরীরের সন্ধির নিম্নভাগকে কক্ষ (বগল) এবং উর্দ্ধভাগকে অংস বা ভুজশিরঃ বলে। অংস হইতে কনুই পর্য্যন্ত স্থানকে প্রগণ্ড (উপরের হাত) বলে। বাহুর মধ্যসন্ধিকে কফোণি বলে। কফোণির পশ্চাদ্‌ভাগ চলিত কথায় কনুই নামে প্রসিদ্ধ। কফোণি হইতে মণিবন্ধ বা কর-সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে

---

* "শরীরং সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বথা বেদ যো ভিষক।
আয়ুর্ব্বেদং স কার্ৎস্নোন বেদলোক সুখপ্রদম॥"
চরক, শারীরস্থান, ৬ অধ্যায়।

"শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচিরেৎ ক্রিয়াঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যস্তরেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভুয়ো জ্ঞান বিবর্দ্ধনম॥
সুশ্রুত, শরীরস্থান ৬ অধ্যায়

প্রকোষ্ঠ (নীচের হাত) বলে। প্রকোষ্ঠ ও করের সন্ধিস্থলকে **মণিবন্ধ** বলে। মণিবন্ধ হইতে করাঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অংশ **কর** বা পাণি নামে খ্যাত। করের রেখাঙ্কিত ভাগকে **করতল** এবং বিপরীত ভাগকে **করপৃষ্ঠ** বলে। **অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা**—পাঁচটী অঙ্গুলির এই পাঁচটী নাম। সক্থির অর্থাৎ সমস্ত পা'খানির সহিত মধ্যশরীরের যে স্থলে সংযোগ হইয়াছে উহার সম্মুখের অংশকে **বঙ্ক্ষণ** (কুঁচকি) এবং পশ্চাদ্‌ভাগকে **নিতম্ব** বা **স্ফিক্** (পাছা) বলে। বঙ্ক্ষণ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানকে **ঊরু** বলে। ঊরু ও জঙ্ঘার (নীচের পায়ের) মধ্যস্থ সন্ধিকে **জানু** (হাঁটু) বলে। জানু হইতে পদের সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে **জঙ্ঘা** (নীচের পা) বলে। জঙ্ঘার নিম্নভাগে দুইদিকের দুইটী অস্থিময় উন্নত প্রদেশকে **গুল্‌ফ*** (পায়ের গাঁট) বলে। গুল্‌ফ এবং পদের সন্ধিস্থানকে **পাদসন্ধি** বা **গুল্‌ফসন্ধি** বলে। ইহার নিম্নভাগকে **পদ** বা **পাদ** বলা যায়। পদের অগ্রভাগকে **প্রপদ** এবং পশ্চাদ্‌ভাগকে **পার্ষ্ণি** (গোড়ালি) বলে। পদের রেখাঙ্কিত ভাগকে পাদতল বা **পদতল** এবং তাহার বিপরীত ভাগকে **পাদপৃষ্ঠ** বলা যায়।

ললাট, দুইটী ভ্রূ, দুই শঙ্খ (রগ্), দুই গণ্ড (গাল), ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডল (উপরের চোয়াল), অধো হনুমণ্ডল (নীচের চোয়াল), ওষ্ঠ, অধর, চিবুক (থুৎনি), তালু (মুখের অভ্যন্তর ভাগের ঊর্দ্ধাংশ), উপজিহ্বা (আলজিব), অধিজিহ্বা (গলার ভিতরে আলজিবের দুইপার্শ্বের দুইটী গ্রন্থি বা টন্‌সিল —Tonsil) ও কণ্ঠ—এইগুলি মস্তক ও গ্রীবার প্রসিদ্ধ উপাঙ্গ। চক্ষুঃ কর্ণাদির বিষয় পৃথক্ ভাবে বলা যাইবে।

স্তনদ্বয়, বক্ষঃ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, নাভি বস্তিদেশ, কটি (কোমর), ও ত্রিক—এই কয়টী মধ্যশরীরের উপাঙ্গ। দুই সক্থি এবং মধ্য-শরীরের সন্ধিস্থলকে **ত্রিক** (মাজা) বলে। নাভির অধোভাগকে **বস্তিদেশ** বলে।

ত্বক্, কলা, পেশী, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, রসায়নী, নাড়ী, রসরক্তাদি ধাতু শরীরের উপাদান স্বরূপ। শ্বাসগ্রহণ, অন্নপরিপাক প্রভৃতি কার্য্যনির্ব্বাহক অনেক গুলি যন্ত্র বা আশয় শরীরের মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী এবং শরীরের ছিদ্র বা দ্বার নয়টী। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে লিখিত হইতেছে।

ত্বক্—বা চর্ম্ম (Skin—স্কিন্) ইহা সর্ব্বদেহের আবরণ স্বরূপ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি এবং স্বেদবহ স্রোতঃ সকল ও সরোম রোমকূপ সমূহের আশ্রয় স্থান। স্থূল দৃষ্টিতে ইহা বহিস্ত্বক্ ও অন্তস্ত্বক্ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বহিস্ত্বক্ পাতলা ও কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি শারীরিক বর্ণের আধার স্বরূপ। এই ত্বক্ অগ্নির সংস্পর্শে ফোস্কা রূপে পরিণত হয়। অন্তস্ত্বক্ স্থূল, শরীরের রক্ষা-

* অনেকে গুল্‌ফ অর্থে গোড়ালি বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক।

কারক এবং শরীরলিপ্ত স্নেহাদির আকর্ষণ কারক। ইহাই স্পর্শজ্ঞানের এবং স্বেদবহ স্রোতঃ সমূহের আশ্রয় স্থান।

সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ—দুগ্ধের উপর যেমন স্তরে স্তরে সর পড়ে, ত্বকেরও সেইরূপ ছয়টী বা সাতটী স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। তন্মধ্যে প্রথম ত্বকের নাম অবভাসিনী, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ত্বক্। অপর পাঁচটী বা ছয়টী ত্বক অন্তস্ত্বকের অন্তর্ভুক্ত।

কলা—(মেম্বেন্ (Membrane) কলা সকল সাধারণতঃ সূক্ষ্ম রেশমী-বস্ত্রের ন্যায়, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ হইয়া থাকে। ইহারা মাংস, অস্থি ও আশয় সমূহের ভিতর দিক্ ও বহির্দ্দিক আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে। স্থান ও কার্য্য ভেদে কলা সকল ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলার দৃষ্টান্ত যথা—মাংসের উপরের আবরণ ঝিল্লী (ফেঁসো) অথবা মাছের পট্‌কা বা পট্‌পটীর উপাদান। উপযুক্ত স্থানে নানাবিধ কলার বিষয় বলা যাইবে।

পেশী—(Muscle—মস্‌ল্)—পেশী সকল মাংসময়, প্রায়শঃ স্থূল রজ্জুর ন্যায়, কদাচিৎ মোটা চাদরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। চলিত কথায় যাহাকে মাংস বলা হয়, তাহা পেশী বা পেশীর উপাদান মাত্র। পেশী সকল দুই প্রকার, যথা—ইচ্ছাধীন ও স্বতন্ত্র। ইচ্ছাধীন পেশাগুলি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র পেশীগুলির চালনা করিতে আমাদের ইচ্ছা আবশ্যক হয় না—উহারা স্বভাবতঃই ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। পেশী সকলের বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

কণ্ডরা—(Tendon—টেণ্ডন্) পেশী সকলের রজ্জুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট শুভ্র, মসৃণ এবং দৃঢ় প্রান্তভাগকে কণ্ডরা বলা যায়। ইহারা স্নায়ু দ্বারা নির্ম্মিত এবং যথেষ্ট ভার সহনে সমর্থ।

স্নায়ু (Ligaments and Tendons †—লিগামেণ্ট এবং টেণ্ডন্)—শ্বেতবর্ণ, মসৃণ, দৃঢ় এবং শণগুচ্ছ সদৃশ। স্নায়ু শব্দ আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—(১) স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ুরজ্জু বা কণ্ডরা। (২) স্নায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্নায়ু বা স্নায়ু-সূত্র। বহুসূত্র সংযোগে প্রস্তুত রজ্জু এবং সূক্ষ্ম সূত্রের যেরূপ প্রভেদ, এই দুই অর্থের প্রভেদও সেইরূপ। স্থূল স্নায়ু প্রধানতঃ অস্থি সমূহের পরস্পর ও অস্থির সহিত পেশীর বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে এবং সূক্ষ্ম স্নায়ু কলা সমূহে, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের চওড়া পেশী সকলের শেষভাগে এবং আমাশয়, পক্কাশয় ও বস্তির কোন কোন প্রদেশে থাকিয়া উহাদের দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে—

"স্নায়ু চার প্রকার, যথা, প্রতানবতী (শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট), বৃত্ত বা রজ্জুর ন্যায়, পৃথু বা চওড়া এবং ছিদ্রযুক্ত। প্রতানবতী স্নায়ু চারিটী শাখায় ও সন্ধিসমূহে আছে। কণ্ডরা-গুলি বৃত্তস্নায়ু। আমাশয় ও পক্কাশয়ের শেষে এবং বস্তিতে ছিদ্রযুক্ত স্নায়ু আছে। পার্শ্ব, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও মস্তকে পৃথু বা চওড়া

* চরকের মতে ত্বক্ ছয়টী এবং সুশ্রুতের মতে সাতটী।

† ইংরাজি (Sinew) 'সিনিউ' শব্দ স্নায়ু শব্দ হইতেই উৎপন্ন। অর্থও অনেকটা একই রূপ। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় 'নার্ভ' বা নাড়ী অর্থের স্নায়ু শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

স্নায়ু আছে। নৌকার কাষ্ঠ ফলক সকল যেরূপ বহুবন্ধনযুক্ত ও গ্রথিত হইয়া জলে বহু ভার বহন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ মনুষ্য-শরীরে যতগুলি সন্ধি আছে, তাহারা বহু স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ বলিয়া মনুষ্যদেহ ভারসহ হইয়া থাকে।*

ধমনী—(Artery)—আর্টারি)—সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত বিশুদ্ধ রক্তবাহিনী প্রণালী বা স্রোতঃ সকলকে ধমনী বলে। হৃদযন্ত্রচালিত বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমে মূল ধমনী, পরে তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা সমূহের ভিতর দিয়া সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হয়। ধমনী সকল বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু ফুসফসগামিনী ধমনী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া হৃদযন্ত্র হইতে ফুসফুসে দূষিত রক্ত বহন করিয়া লইয়া যায়।

সিরা (Vein—ভেন)—সর্ব্বদেহব্যাপী দূষিত রক্ত বহনকারী স্রোতঃ সকলকে সিরা বলে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম আকারে দেহের সর্ব্বত্র অবস্থিতি করে এবং ক্রমশঃ পরস্পরে মিলিত হইয়া স্থূল সিরাসমূহে পরিণত হয়। সর্ব্বদেহের দূষিত রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যাওয়াই ইহাদের কার্য্য। সিরা সকল দূষিত রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু চারিটী সিরা ফুসফুসদ্বয় হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যায়।

রসায়নী (Lymphatic—লিম্ফাটিক)—লসীকা নামক পাতলা ও স্বচ্ছ রসবাহিনী প্রণালীকে রসায়নী বলে; রসায়নী প্রণালী সকল সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত আছে। কক্ষ, বক্ষণ ও গলদেশ প্রভৃতি স্থানে রসায়নী প্রণালী গুলির মধ্যে মধ্যে কুঁচ বা নিমফলের ন্যায় রসগ্রন্থসমূহে অবস্থিত।

নাড়ী—(Nerve—নার্ভ)—নাড়ী সকল কোমল সূক্ষ্ম,পীতাভ এবং রন্ধ্রহীন তারের মত। স্থান ও প্রয়োজন ভেদে উহারা কোথাও সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায়, কোথায় বা সূত্রগুচ্ছের ন্যায় আকারে অবস্থিত। মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্না কাণ্ড নামক স্থূল নাড়ীগুচ্ছ (Spinal cord) অন্যান্য অধিকাংশ নাড়ীর মূল। কার্য্য ভেদে নাড়ী সকল দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি নাড়ী চেষ্টা শক্তি বহন করে এবং কতকগুলি নাড়ী ইন্দ্রিয় সকলের বোধ বা সংজ্ঞা বহন করে। টেলিগ্রাফের প্রধান কেন্দ্র হইতে টেলিগ্রাফের তার সকল যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নাড়ী হইতে নাড়ী সকলও সেইরূপ শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত

---

* স্নায়ুশ্চতুর্বিধা বিদ্যাস্তাস্তু সর্ব্বা নিবোধ মে।
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্ব্যশ্চ শুষিরাস্তথা॥
প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ।
বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ ;
আমপক্কাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু।
পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্তথ॥
নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্ব্বহুভির্যুতা।
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা।
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতা।
স্নায়ুভির্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ॥"
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়।

আছে। টেলিগ্রাফের কেন্দ্রস্থল হইতে তার দ্বারা যেমন অন্যান্য স্থানে আদেশ পাঠান যায়, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নাড়ী হইতেও সেইরূপ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে কার্য্য করিবার আদেশ পাঠান হয়। আবার অন্যান্য স্থান হইতে টেলিগ্রাফের কেন্দ্র স্থলে যেমন সংবাদ দেওয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিলে সে সংবাদ নাড়ী পথেই মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের বোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং চেষ্টাবহা (Motor) ও সংজ্ঞাবহা (Sensory) ভেদে নাড়ী সকল দুই প্রকার যথাস্থানে নাড়ী সকলের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলা যাইবে।

স্রোতঃ—শরীরে যে সমস্ত নল বা পথ আছে, সেই সকলের সাধারণ নাম স্রোতঃ। চরকে কথিত হইয়াছে,—স্রোতঃ সকল পরিণত ধাতু সমূহ বহনকারী পথ। ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। কারণ অন্ন, মূত্র, মল, ঘর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল প্রণালীর ভিতর দিয়া বাহিত হয়, তাহাদিগকেও স্রোতঃ বলা যায়।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটীকে ধাতু বলে :—

(১) রস—সর্ব্বপ্রকার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে সৌম্য অর্থাৎ শৈত্যগুণযুক্ত জলীয় সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রস বলা যায় ; "রস" ধাতুর অর্থ—গতি। শরীরের সর্ব্বত্র অহরহঃ গমন করে বলিয়া "রস" নাম হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে রস—যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া রঞ্জক পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হইলে রক্ত নামে অভিহিত হয়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে, দেহীদিগের শরীরস্থ বিশুদ্ধ রস রঞ্জকপিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।*

(২) রক্ত—(Blood— ব্লড)— সকল ধাতুর পোষক বলিয়া রক্ত জীবন রক্ষার প্রধান উপায় স্বরূপ। রক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীরের অন্যান্য ধাতুও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

লসীকা— (Lymph—লিম্ফ)—রক্তের পাতলা স্বচ্ছ জলীয়াংশ লসীকা নামে খ্যাত। ইহা রসায়নী প্রণালী সমূহের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। লসীকা রক্ত বা রসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পৃথক ধাতুরূপে উহার গণনা করা হয় না।

(৩) মাংস—(Muscnlar tissue) পেশী সমূহের উপাদান স্বরূপ কোমল রক্তবর্ণ এবং তন্তুময়।

(৪) মেদ—(Fat) ঘৃতের ন্যায় ঘন শরীরের স্নেহময় ধাতু। ইহা প্রধানতঃ উদরের মধ্যস্থ ঝিল্লী বিশেষের এবং ত্বকের নিম্নে অবস্থিতি করে। মাংসের স্নেহভাগকে বসা বলে। ইহা মেদের ন্যায় উপাদান বিশিষ্ট এবং মেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(৫) অস্থি—(Bone—বোন)—শরীরের অবলম্বন স্বরূপ দৃঢ় কঠিন ধাতু, চলিত কথায় হাড়।

(৬) মজ্জা—(Bone marrow—বোন ম্যারো) অস্থির মধ্যস্থিত ধাতুকে মজ্জা বলে।

* রঞ্জিতাস্তেজসা তাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাম্।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে॥
সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১৪ অধ্যায়।

ইহা কতকটা মেদের ন্যায় উপাদানবিশিষ্ট হইলেও কার্য্য ভেদে পৃথক ধাতু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

(৭) শুক্র—স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তরল, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ধাতু। ইহার মধ্যে গর্ভোৎপাদক জীবাণু সমূহ থাকে। গর্ভোৎপাদক পুরুষের দেহেই শুক্র আছে। কিন্তু সুশ্রুত স্ত্রীশুক্রেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

রজঃ—রস হইতে স্ত্রীলোকের রজঃ বা আর্ত্তব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের গর্ভোৎপাদক ধাতু বীজাণু বর্ত্তমান। সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সে রজঃপ্রবৃত্তি এবং পঞ্চাশ বৎসরে রজো নিবৃত্তি হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় রজঃ উৰ্দ্ধগামী হইয়া স্তন্যরূপে পরিণত হয়। রজঃ ও স্তন্যরস রক্ত ধাতুর অন্তর্ভুক্ত।

আশয়—শরীরে তিনটী গুহা বা গহ্বর আছে এবং এই তিনটী গুহার মধ্যে শরীরের বিবিধ আশয় বা যন্ত্র অবস্থিত। তিনটী গুহা, যথা—শিরোগুহা, উরোগুহা এবং উদর গুহা। প্রত্যেক গুহা অবস্থিত আশয় সকলের বিষয় পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

শিরোগুহা—এই গুহার মধ্যে মস্তিষ্ক, অনুমস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কাণ্ডের শীর্ষদেশ অবস্থিত।

উরোগুহা—এই গুহায় ফুসফুস নামক দুইটী শ্বাস গ্রহণ যন্ত্র এবং রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র হৃদয় অবস্থিত।

উদরগুহা—এই গুহার মধ্যে আমাশয়, পক্কাশয়, গ্রহণী, যকৃৎ,প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, বৃক্কদ্বয় বস্তি, স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় ও দুইটী বীজ কোষ আছে।

আমাশয়—(Stomach—ষ্টম্যাক)—আমাশয়ের আকার ক্ষুদ্র দৃতির (ভিস্তির বা মশকের) ন্যায়। ইহা সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যের আধার।

পক্কাশয়—(Intestine) ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রকে মোটের উপর পক্কাশয় বলে। আমাশয়ে আম বা কাঁচা অন্নাদি থাকে, তথায় উহার অল্প পাক হইলেও প্রধানতঃ অন্ত্র মধ্যে আসিয়াই পাক বা পরিণতি সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য আমাশয় ও অক্কাশয় এই দুইটী সংজ্ঞা হইয়াছে।

গ্রহণী—(Ducodenum—ডিওডিনম) আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্ত্তী দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানকে গ্রহণী বলে। গ্রহণী শব্দ অনেকস্থলে আমাশয় ও পক্কাশয়ের ভিতরের আবরণ ঝিল্লী বা কলা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যকৃৎ—(Liver—লিভার)—উদরের উপরি ভাগের দক্ষিণদিকে পঞ্জরের মধ্যে যকৃৎ অবস্থিত। ইহা পাচক ও রঞ্জক পিত্তের উৎপত্তি স্থান। পিত্তকোষ (Gall-Bladder—গলব্লাডার) নামক একটি থলী যকৃতে সংলগ্ন আছে।

প্লীহা—(Spleen—স্প্লীন)—রঞ্জক পিত্তের অন্যতম উৎপত্তি স্থান। প্লীহা উদরের উপরি ভাগে বামদিকে পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত।

অগ্ন্যাশয়—(Pancreas প্যাংক্রিয়াস)*—আমাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। সর্ব্ব-

* "অগ্ন্যাশয়"—সংজ্ঞাটি প্রবন্ধ লেখক কৃত। অনেকে ইহাকে 'ক্লোম" বলেন, কিন্তু সে মত যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার কারণ যথাস্থানে বলা হইবে।

অন্ন পরিপাকে সমর্থ প্রধান আগ্নেয় রস ইহা হইতেই পরিস্রুত হয়। ইহার দক্ষিণপ্রান্ত বিস্তৃত এবং বামপ্রান্ত ক্রমে সরু।

বৃক্ক—(Kidney—কিড্‌নি)- কটিদেশে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে শিমের বীজের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট দুইটী বৃক্ক আছে। বৃক্কদ্বয় রক্ত হইতে মূত্র নিষ্কাশন করে।

বস্তি—(Bladder—ব্ল্যাডার)—ইহা নাভির অধোভাগে মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বৃক্ক দ্বারা উৎপন্ন মূত্রের আধার স্বরূপ। পেন কলমের ন্যায় দুইটী সূক্ষ্ম নল দ্বারা মূত্র বৃক্ক হইতে বস্তিতে নীত হয়। উহাদিগকে গবীনী বা মূত্রস্রোতঃ (Utrerus —ইউটরস)—বলে।

গর্ভাশয়—(Utrerus—ইউটরস)—স্ত্রীলোকদিগের যোনির উর্দ্ধমুখের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র কলসের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। গর্ভাবস্থায় গর্ভের বৃদ্ধির সহিত গর্ভাশয়ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং প্রসবান্তে পুনরায় ছোট হইয়া যায়।

শিশুপালন।

খাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী)

খাদ্যের কার্য্য কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন কোন্ প্রকার খাদ্যে আমাদের দেহের বৃদ্ধি হয়, গঠন হয় এবং রক্ষা হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দুই প্রকার গুণ বিশিষ্ট খাদ্য আমাদের দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়। এক প্রকার খাদ্যে আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ, গঠন এবং বৃদ্ধি হয়। আর এক প্রকার খাদ্যে আমাদের জীবনী শক্তি জন্মে। সুতরাং আমাদের খাদ্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) মাংসের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট খাদ্য। (flesh like substances) ইহা হইতে আমাদের দেহ যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।

(২) তাপ উৎপাদক খাদ্য (combustible substance) ইহা আমাদের জীবন রক্ষা করে।

(১) মাংস বর্দ্ধক খাদ্য কি ? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকার খাদ্যে চারিটি জিনিস আছে। তাহাদের নাম যবক্ষার বাষ্প (nitrogen), অঙ্গারাম্লজান (carbon), হাইড্রোজেন এবং অম্লজান বাষ্প

(oxygen)। এই শ্রেণীর খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে যবক্ষারজান বাষ্প (nitrogen) নাই। এই যবক্ষার জান বাষ্পের অস্তিত্বই মাংসের ন্যায় খাদ্যের বিশেষত্ব। এই কারণে এই খাদ্যকে যবক্ষার বাষ্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous food) বলে। এই খাদ্য খাইলে দেহে মাংস হয়। প্রধানতঃ পশু মাংসে এই যবক্ষারজান আছে। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ, ডিম, সকল রকম শস্য (corn), ডাল, সীম বা মটর জাতীয় শস্যে (peas and beans) এবং টাট্‌কা সব্জিতে কিয়ৎ পরিমাণে এই nitrogen আছে। যবক্ষার বাষ্প (nitrogen) মাংসের মধ্যে যেমন, শাক সব্জিতেও তেমনি বিদ্যমান আছে। তবে মাংসের মধ্যে ইহা অবিকৃত ভাবে পাওয়া যায়।

(২) তাপ উৎপাদক খাদ্যে অঙ্গারাম্লাজান (carbon) হাইড্রোজেন এবং অম্লজান বাষ্প (oxygen) আছে। এই খাদ্য দুই প্রকারের। (ক) শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starches) এবং (খ) মেদময় (fats) খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে সকল খাদ্যে শ্বেতসার এবং চিনি আছে, সে সকল খাদ্যই প্রথম শ্রেণীর (ক) অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে carbohydrates বলে। যে সকল খাদ্যে মাখন, চর্ব্বি ক্রিম এবং তৈল আছে সে সমুদয়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর (খ) অন্তর্গত। ইহাকে hydrocarbons বলে। শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা মেদময় খাদ্যে carbon (অঙ্গারদ্রাবক) অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই কারণে মেদময় খাদ্য শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ উৎপাদন করে এবং জীবনী শক্তি প্রদান করে।

খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য। আমাদের দেহরক্ষার জন্য খনিজ পদার্থ: বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন। জল এবং কয়েক প্রকার লবণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন সাধারণ লবণ, phosphate of lime, এবং আরো কয়েক প্রকার লবণ। সমুদয় জীবন্ত দৈহিক সূত্রের (tissues) গঠন এবং কার্য্য ক্ষমতা লাভের জন্য জল এবং লবণের প্রয়োজন হয়। পরিপাক ক্রিয়ার জন্য যে চারিটি রসের আবশ্যক হয় তাহার কার্য্য চালাইবার জন্য, রক্ত সঞ্চালনের জন্য এবং দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরস এবং ভিজা রাখিবার জন্য জলের আবশ্যক। রক্তে, মাংসপেশীতে এবং দেহের সমুদয় নরম স্থানে লবণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লবণ হাড় এবং দাঁতের জন্যই অধিক পরিমাণে কাজে লাগে। যে দাঁতে যত বেশী (lime salt) চুণের ভাগ থাকিবে, সে দাঁত তত দৃঢ় হইবে। তাহা হইলে ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেহের গঠন, বৃদ্ধি, কার্য্য ক্ষমতা, এবং জীবনী শক্তির জন্য নিম্নলিখিত চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। যথা—

(১) যবক্ষার বাষ্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous substances)। মাংসের গুণ বিশিষ্ট খাদ্য। এই খাদ্য দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পূরণের জন্য প্রয়োজন হয়।

(২) শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starchy substances) তাপ উৎপাদক খাদ্য। ইহা দেহে তাপ এবং জীবনী শক্তি (vital force) জন্মায়।

(৩) মেদময় খাদ্য। ইহাও তাপ উৎপাদক কিন্তু শ্বেতসার খাদ্য অপেক্ষা ইহা অধিক পরিমাণে তাপ এবং জীবন শক্তি উৎপন্ন করে।

(৪) খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য।

(mineral substances), জল এবং লবণ—দেহ গঠন এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতা সঞ্চার করে।

সবল. কার্য্যক্ষম, সুস্থ জীবন ধারণের জন্য আমাদের এই চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। শিশুর খাদ্যও এই চারি প্রকার গুণ বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মাতৃদুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনোপযোগী এই চারিটি জিনিস উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পশুর দুগ্ধে এই চারিটি জিনিস কম বেশী পরিমাণে আছে। এই কারণে সে সকল দুগ্ধ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া শিশুকে দিতে হয়। যেমন গাভীর দুগ্ধে যবক্ষার বাষ্পাত্মক (nitrogen) পদার্থ বা ছানা মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে এবং শর্করার অংশ কম আছে। এই কারণে গাভীর দুগ্ধে জল কিংবা বার্লি মিশাইয়া এবং একটু চিনি দিয়া শিশুকে দিলে কতকটা মাতৃদুগ্ধের ন্যায় হয়।

আমাদের আহার্য্য দ্রব্য দুই প্রকারের।

(১) উদ্ভিজ্জ। চাল, ডাল, ময়দা, শাক, সব্জী তরি তরকারি প্রভৃতি (vegetable food) উদ্ভিজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকারের শস্য (cereals) গম, ওট, বার্লি, রাই, চাল, ভুট্টা (খ) নানাপ্রকারের ডাল (গ) টাট্‌কা সব্জি, আলু, কপি প্রভৃতি (ঘ) নানাপ্রকার ফল।

(২) প্রাণীজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকার পশু মাংস যেমন গরু, ভেড়া, পাঁটা ইত্যাদি (খ) poultry & game যেমন মুরগি, হাঁস, টার্কি, খরগোস ইত্যাদি (গ) নানাপ্রকার মাছ (ঘ) shell fish যেমন কাঁকড়া, oysters, shrimps। (ঙ) দুধ, পনির, মাখন এবং ক্রিম (চ) ডিম।

উপরে খাদ্যের যে চারিটি উপাদানের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদের আহার্য্য দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে ঐ উপাদানের দুই তিনটি করিয়া সন্নিবেশিত হইয়া আছে। কিন্তু কোনটিতে একটি উপাদান বেশী আছে, কোনটিতে কম, আবার কোনটিতে বা কোন উপাদান একেবারেই নাই, যেমন ডিম একটি সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর এবং পূর্ণখাদ্য হইলেও তাহাতে শ্বেতসার পদার্থ একেবারেই নাই. এই জন্য শুধু ডিম খাইয়া মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। ইহার সহিত অন্য খাদ্যের ও প্রয়োজন হয়। এই কারণে দুই তিন প্রকারের খাদ্য মিলাইয়া যাহাতে আমাদের খাদ্যের মধ্যে উপরোক্ত চারিটি পদার্থ উপযুক্ত ভাবে থাকে সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি।

সাধারণতঃ আমরা প্রত্যহ যাহা আহার করি তাহাতে উপরোক্ত চারিটি পদার্থই সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে। আমরা অজ্ঞাতসারেই খাদ্যের গুণাগুণ না জানিয়াই শরীর ধারণোপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করি। তবে এসম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারি এবং অনর্থক কতকগুলি মসলাযুক্ত গরম ও দুষ্পাচ্য খাদ্য না খাইয়া পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি।

শিশুদিগের জন্যও তাহাদের দেহ গঠনোপযোগী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক বৃদ্ধির সময় তদুপযুক্ত খাদ্য বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানের সহিত প্রদান করিতে পারি। শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে মাতার পরিস্ফুট জ্ঞান থাকিলে তাঁহার শিশু সুস্থ, সবল,

কর্ম্মঠ জীবন ধারণ করিয়া এবং মেধাবী হইয়া তাঁহাকে এবং মানব সমাজ ও দেশকে সুখী করিবে। এ বিষয়ে মাতার দায়ীত্ব কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং মাতৃজাতিকে জ্ঞানালোকের মধ্যে বর্দ্ধিত করিতে প্রত্যেক দেশ হিতৈষী দায়ী। শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের ভার প্রত্যেক মাতার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। মাতাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত এই গুরুভার সম্পাদন করিতে হইবে। অজ্ঞানতার সহিত, গতানুগতিকের ন্যায় শিশু পালন করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা বীর, ধর্ম্মপ্রাণ, বুদ্ধিমান মহৎ-হৃদয়শালী সন্তান আকাঙ্খা করিতেছি। সমগ্র সভ্য জগতের সহিত সংগ্রামে তাঁহাদিগকেই স্বদেশ রক্ষা করিতে হইবে। মূর্খ মাতার সন্তান দ্বারা এই মহৎ কার্য্য কখনো সাধিত হইবে না।

দুগ্ধ।

দুগ্ধই অধিকাংশ প্রাণীর শৈশবের একমাত্র আহার। দুগ্ধ পান করিয়াই অধিকাংশ প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। একটি সুস্থ শিশু কেবল দুগ্ধ-পান করিয়াই যদি বর্দ্ধিত হয় তবে তাহার এক বৎসর বয়সের সময়ের ওজন তাহার জন্মকালীন ওজনের তিন গুণ বেশী হইবে। দুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনের সমুদয় উপাদান বিদ্যমান আছে। ইহাতে দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় নিবারণ হয়। দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং জীবনী শক্তি (Vital force) জন্মে। ইহাকে একটি পূর্ণ খাদ্য (Complete Food) বলা যায়, কারণ খাদ্যের সমস্ত গুণই ইহাতে বিদ্যমান আছে।

দুগ্ধে (১) যবক্ষার বাস্পাত্মক (nitrogenous) পদার্থ ছানা বা casein আছে। (২) মেদময় পদার্থ (Fat) ক্রিম আছে (৩) শর্করা এবং (৪) লবণ ও জল আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের খাদ্যে যে চারিটি উপাদান থাকিলে তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা হয় তাহার সকলি দুগ্ধের মধ্যে আছে।

ছানা (casein)। দুগ্ধে যে যবক্ষার বাস্পাত্মক পদার্থ (nitrogenous matter) আছে তাহাকে দুগ্ধের casein বা প্রোটীড বা ছানা বলে। ইহা মাংসের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট (flesh like substance) পদার্থ। দুগ্ধের ছানাই দুগ্ধের যবক্ষার বাস্পাত্মক পদার্থ। পাকস্থলীতে পাচক রস প্রথমে দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করে, তারপর ঐ ছানাকে জীর্ণ করে।

জীর্ণ করা ছানা শিশুর দেহের বৃদ্ধি সাধন করে এবং ক্ষয় নিবারণ করে।

ক্রিম। দুগ্ধের ক্রিমই দুগ্ধের মেদময় পদার্থ বা Fat। মেদের গোলকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা গুলি দুগ্ধে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া দুগ্ধের রঙ সাদা। অনুবীক্ষণের নীচে এক ফোঁটা দুধ রাখিলে এই গোলক দেখা যায়। তাহাদের ওজন দুগ্ধ অপেক্ষা হালকা, এই কারণে তাহারা উপরে ভাসিয়া উঠে। ইহাই দুগ্ধের ক্রিম। ঘোল করিবার যন্ত্রে দুধ মন্থন করিলে সমস্ত ক্রিম একত্র হইয়া মাখন হয়।

দুগ্ধের শর্করা। দুগ্ধকে ছানা করিয়া ছানা তুলিয়া লইলে যে জলটা পড়িয়া থাকে তাহাতে এই চিনির অস্তিত্ব বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। Cane sugarর মত এই চিনি অত মিষ্ট নয়। এই চিনি শ্বেতসার পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্যের অন্তর্ভূক্ত হইলেও ইহার প্রকৃতি তাহা অপেক্ষা ভিন্ন। এই চিনি জীর্ণ করা শ্বেত-

সার পদার্থ সুতরাং ইহা আর পরিপাক করিবার প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধের চিনি শ্বেতসার পদার্থের অন্তর্গত হইলেও এই কারণে শিশুকে ইহা আর পরিপাক করিতে হয় না। ইহা পূর্ব্ব হইতেই পরিপাক করা থাকে। শিশুর তখন শ্বেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে না বলিয়া ভগবান মাতৃদুগ্ধে শ্বেত সার পদার্থকে পূর্ব্ব হইতেই পরিপাক করিয়া চিনিরূপে রাখিয়াছেন। অথচ দুগ্ধে চিনি না থাকিলে শিশুর দেহে তাপ উৎপন্ন হইত না। দুগ্ধের ক্রিম এবং চিনি অঙ্গার বাস্পাত্মক পদার্থ (carbonaceous)। ইহারা দেহে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

লবণ। দুগ্ধে যে লবণ আছে তাহা শিশুর দেহের দৈহিক সূত্রগুলি (tissues) গঠন করে। হাড় এবং দাঁতের জন্য যে phosphate of limeর প্রয়োজন দুগ্ধে তাহা লবণ রূপে আছে।

জল। দুগ্ধে যে জল আছে তাহা শিশুর দেহের পক্ষে যথেষ্ট। বয়স্কদের যতটা জলের প্রয়োজন, দুগ্ধের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা দুগ্ধে জল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। বয়স্ক লোকদিগের আকারের তুলনায় তাহাদের যতটা জলের আবশ্যক শিশুর তদপেক্ষা অধিক জলের প্রয়োজন।

মাতৃ দুগ্ধই শিশুর একমাত্র স্বাভাবিক আহার। তাহা না পাওয়া গেলে অন্য প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সেই দুধ যতটা মাতৃ দুগ্ধের সমগুণ করা যায় ততই শিশুর দেহরক্ষার পক্ষে উপযোগী হয়। দুগ্ধের মধ্যে যে সকল উপাদান আছে তন্মধ্যে দুগ্ধের ছানাই পরিপাক করা কষ্ট। অন্যান্য উপাদান অতি সহজে পরিপাক হয়। এই কারণে অন্য প্রাণীর দুগ্ধের ছানার পরিমাণ যাহাতে মাতৃদুগ্ধের ছানার সমান হয় সেইরূপ করিতে হইবে। যেমন গাভীর দুগ্ধে মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক ছানা আছে বলিয়া গাভীর দুগ্ধে জল কিংবা বার্লি এবং একটু চিনি মিশাইলে তাহা কতকটা মাতৃদুগ্ধের তুল্য হয়। শিশুর জন্মের প্রথম কয়েকমাস যতটা দুধ তাহার তিন গুণ জল কিংবা বার্লির জল মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। প্রথম মাসে এইরূপ জল ও চিনি মিশান দুগ্ধ সমস্ত দিনে দশ ছটাক যেন শিশুকে পান করান হয়। ক্রমে ক্রমে জলের পরিমাণ কমাইয়া এবং দুধের পরিমাণ বাড়াইয়া ছয় মাস বয়সের সময় প্রতিদিন ৩০ ছটাক দুধ শিশুকে দিবে। এ সময় দুধ ও জল সমান ভাগে মিশাইতে হইবে ছয়মাস বয়স হইতে শিশুর শ্বেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে। সুতরাং এই সময় হইতে সামান্য পরিমাণে কোন শ্বেতসার পদার্থ দুধের সহিত অথবা পৃথকভাব দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় হইতে শ্বেতসার পরিপাক করিবার শক্তি জন্মিলেও তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে। দুই বৎসরের পূর্ব্বে এ শক্তি ভাল করিয়া জন্মে না। শিশুকে এক বৎসর পর্য্যন্ত জল মিশান দুধ দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর জলের পরিমাণ ক্রমে কমাইয়া আনিয়া দুই বৎসর বয়সের সময় খাঁটি দুধ দেওয়া যাইতে পারে।

শিশুকে যে খাদ্যই দেওয়া যাক না কেন, তাহার দেহ গঠন ও রক্ষার জন্য টাটকা বিশুদ্ধ দুগ্ধ ব্যতীত উপযোগী খাদ্য আর নাই। শিশুর স্বাস্থ্য কেবল উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিতরূপে খাওয়ানের উপর নির্ভর করে। পুষ্টিকর খাদ্য ও অনিয়মিত ভাবে খাওয়াইলে শিশুর

স্বাস্থ্যহানি হয়। শিশুর দেহ অতি দ্রুতভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষয়ও বেশী হয়। সুতরাং তাহার দেহরক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে যব ক্ষারবাম্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous food) প্রয়োজন।

শিশুর ছুইবার আহারের সময়ের মাঝ খানে কোন খাদ্য দিবেনা। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বের আহার যেন লঘু হয়। শিশুকে কোন উত্তেজক দ্রব্য কখনো খাইতে দিবেনা, ইহাতে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুকে বয়স্কদের অপেক্ষা অধিক মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে।

মাতৃ দুগ্ধের অভাব হইলে সাধারণত গাভীর দুগ্ধই শিশুকে দেওয়া হয়। সহরের বাহিরের গাভী সকল উন্মুক্ত প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায় এবং সতেজ শ্যামল তৃণ খাইয়া থাকে। এই কারণে পল্লীগ্রামের গাভীর দুগ্ধ খাইতে সুমিষ্ট সুস্বাদু এবং অধিক পুষ্টিকর। পল্লী-গ্রামের গাভীর দুগ্ধের গুণ ক্ষারজ alkaline. মাতৃদুগ্ধ ও ক্ষারজ। কিন্তু সহরের গাভী সকল গোয়ালে বহু গাভীর সহিত একত্রে বাঁধা থাকে এবং চরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া ঘাস খাইতে পায় না বলিয়া তাহাদের দুগ্ধে অম্ল আছে। এই কারণে সহরের গাভীর দুগ্ধ শিশুর পক্ষে তেমন উপযোগী হয় না। দুধে অম্ল আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে একটুকরা নীল রঙের litmus paper দুধে ডুবাইয়া দেখিতে হয়। যদি দুধ অম্ল সংযুক্ত হয় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ লাল রঙে পরিবর্ত্তিত হইবে। একটু চুণের জল কিংবা একটু Bi-carbonate of soda ঐ দুধে মিশাইলে তাহার অম্লত্ব দূর হইবে। এই চুণের জল মিশান দুধে ঐ লাল রঙের litmus paper ডুবাইলে দেখা যাইবে যে ইহার রঙ তখনি পুনরায় নীল হইয়াছে। দুধ বেশ ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইলে সকল রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু যদি দুধে প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তাহা ফুটাইয়া লইলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। দুধ ফুটাইয়া অল্প ঠাণ্ডা করিয়া বেশ পরিষ্কার একটী কাচের, পোর্সিলেন কিংবা চিনা মাটীর পাত্রে কাচের রিকাবি দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। শিশুর দুগ্ধ কখনো কোন ধাতুর পাত্রে অধিকক্ষণ রাখিবেনা তাহা হইলে দুধের গুণ নষ্ট হয়।

শিশুর আহার।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে, মাতার কোন পীড়া হইলে কিংবা শিশু মাতৃ দুগ্ধ ছাড়িলে অন্য প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সাধারণত গাভীর দুগ্ধই এ সব ক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাহাই শিশুকে খাওয়ান হয়।

(১) মাতার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি কিংবা অন্য কোন সাময়িক কারণ এবং দুগ্ধের অল্পতাবশতঃ অথবা দুগ্ধ একেবারেই না থাকিলে শিশুকে জন্মের প্রথমদিন হইতেই অন্য প্রাণীর দুগ্ধে পালন করিতে হয়।

(২) মাতার শারীরিক দৌর্ব্বল্য কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ কোন কোন শিশুকে অকালেই মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইতে হয়।

(৩) অধিকাংশ শিশু ঠিক সময়েই অর্থাৎ দশমাস বয়সে মাতার দুধ ছাড়ে। এই তিন শ্রেণীর শিশুর জন্যই গাভীর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বাজারে বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ নানাপ্রকারের পাওয়া যায়। এই সকল

দুগ্ধের মধ্যে Mellin's food, Glako এবং Allenbury's milk food শিশুর পক্ষে উপযোগী। এই সকল খাদ্যে শিশুর পক্ষে অনিষ্টকারী শ্বেতসার পদার্থ (starch) নাই। Horlick's malted milk শিশুর ৮।১০ মাস বয়স হইলে দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল প্রকার কৃত্রিম দুধই ২।১ বারের বেশী সুস্থ শিশুকে খাওয়ান যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে রুগ্ন মাতার রুগ্ন শিশুকে এই সব কৃত্রিম দুধেই বর্দ্ধিত করিতে হয়। allenburys milk food তিন প্রকারের আছে। প্রথম দুইপ্রকার দুধ শিশুর ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত দিবার নিয়ম তারপর ৩নং দুধ দিতে হয়। তিন নম্বরের দুধে শ্বেতসার পদার্থ আছে বলিয়া ইহা ছয় মাসের পূর্ব্বে শিশুকে খাওয়াইলে অনিষ্ট হয়।

প্রথম হইতেই শিশুকে চামচে বা ঝিনুকে করিয়া দুধ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম। এইরূপে দুধ খাওয়াইলে শিশুর কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুধ খাওয়া হইলে বাটি ও চামচ মাজিয়া ফেলিলেই হইল। কিন্তু অনেক সময় বোতলে করিয়া দুধ দিতে হয়। পূর্ব্বে লম্বা নল সংযুক্ত বোতলে দুধ খাওয়ান হইত। ঐ নলের ভিতর ভাল করিয়া পরিষ্কার করা যাইত না বলিয়া ঐরূপ বোতলে দুধ খাওয়ান ভয়ানক অনিষ্টকর ছিল এবং তাহাতে কত শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে mellins bottle allenbury feeding bottle এবং glascobottle বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। এই সব বোতলের দুই মুখই খোলা। বড় মুখে দুধ খাইবার জন্য একটি ছোট 'টিট' আছে এবং ছোট মুখে একটি 'ভালভ' আছে। দুধ খাইবার সময় বাতাস চলাচলের জন্য পশ্চাদ্দিকের ভালভএ একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। যে বোতলের কেবল একদিক খোলা, অন্য দিক বন্ধ সেরূপ বোতলে শিশুকে দুধ খাওয়াইলে শিশুর পেটে বায়ু জন্মিতে পারে অথবা পেট ব্যথা হইবার সম্ভাবনা।

এই বোতলও তাহার 'টিট' ও 'ভালভ' সর্ব্বদা খুব পরিষ্কার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা শিশুর গুরুতর পীড়া যেমন পেটের অসুখ, কলেরা, টাইফয়েড, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা। বাজার হইতে বোতল টিট ভালভ কিনিয়া একটি পরিষ্কার পাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া একটু bi-carbonate of soda দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ বোতল, টিট, ভালভ রাখিয়া দিবে; তারপর ঐ পাত্র আগুনে চড়াইয়া দিবে। ফুটীয়া উঠিলে নামাইয়া রাখিবে। পাত্রের জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে জল হইতে বোতল, টিট এবং ভালভ উঠাইয়া রাখিবে। বাজার হইতে বোতল কিনিবার পর তাহা এইরূপে সিদ্ধ না করিয়া কখনো শিশুকে তাহাতে দুধ খাইতে দিবে না, ইহাতে নানারূপ অসুখে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। শিশুর দুধ পান হইলে অবশিষ্ট দুধ থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিবে কিংবা গৃহের আর কেহ তাহা ব্যবহার করিতে চাহিলে তাহাকে দিবে কিন্তু তাহা কখনো শিশুর দ্বিতীয়বার আহারের জন্য রাখিয়া দিবেনা। শিশুর দুধ খাওয়ান শেষ হইলে গরম জলে সোডা দিয়া তদ্বারা টিট, ভালভ এবং বোতল পরিষ্কার করিবে। বোতল ধুইবার ব্রাস দিয়া বোতলের ভিতর খুব ভাল করিয়া ধুইবে। যেন কোন কোণে দুধের কণা কি কোন ময়লা না থাকে। টিট ও

ও ভালভ ধুইবার ছোট ব্রাস দিয়া উহাদের ভিতর বাহির বেশ করিয়া ঘসিয়া ধুইবে। তারপর বোতলটি এক পরিস্কার পাত্রে ঠাণ্ডা জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া দিবে এবং টিট ও ভালভ একটি কাচের বাটিতে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিবে। প্রতিবার দুধ পানের পরই এইরূপে বোতল টিট ভালভ সোডা মিশ্রিত গরম জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইবে তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইবে। মনে রাখা উচিত যে পরিচ্ছন্নতাই শিশুর জীবন। শিশুর আহার, পরিচ্ছদ শয্যা, আহারের পাত্র প্রভৃতি পরিস্কার রাখিলে শিশুকে অনেক রোগের হাতে হইতে রক্ষা করা যায়। অপরিচ্ছন্নতাই শিশুর পেটের অসুখের কারণ। পরিচ্ছন্ন হইলে শিশুকে এই অসুখ হইতে বাঁচান যায়। যে সব স্থানে কলের জল নাই সেসব স্থানের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে দেওয়া উচিত।

প্রথম ছয় মাস শিশুকে দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এইরূপে দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। কিন্তু রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত শিশুর পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য, এই সময়ের মধ্যে শিশুকে কিছুই খাইতে দিবেনা। প্রথমতঃ শিশুকে এইরূপে অভ্যাস করান সম্ভবতঃ কষ্টকর হইতে পারে কিন্তু ক্রমে শিশু এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে অভ্যস্থ হইবে। শিশুকে যত সদভ্যাসে অভ্যস্থ করান যায় ততই শিশুর এবং শিশুর মাতার পক্ষে মঙ্গল। প্রথম প্রথম শিশু রাত্রে কাঁদিলে তাহাকে ২।১ চামচ জল দিয়া একটু চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইলেই শিশু ঘুমাইয়া পড়িবে। অনেকে মনে করেন যে সব শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের আহারের কোন নিয়ম রাখিবার প্রয়োজন নাই। যখন তখন খাওয়াইলেই চলিবে। বস্তুতঃ এরূপ সর্ব্বদাই দেখা যায় যে শিশু কাঁদিলেই অমনি মাতা তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করেন। এরূপ করা শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাতে শিশুর অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পেটের অসুখ হইতে পারে। ক্রমাগত খাইতে থাকিলে পাকস্থলী আহার পরিপাক করিবার জন্য মোটেই সময় পায় না। ইহাতে শিশুর পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

বঙ্গে শিশু মৃত্যু।

—৽*৽—

বাঙ্গালা দেশে বালিকা অপেক্ষা বালকের জন্ম হয় বেশী। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে মোট শিশু জন্মিয়াছিল ১৪,৮৯,১৩৫। ইহার মধ্যে বালকের সংখ্যা ৭৭,১৩,১৩ এবং বালিকার সংখ্যা ৭১৭,৮২২। জন্মের মত বালকও কিন্তু মরিয়া থাকে বেশী। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে যত বালক জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১,৮১,৫৪৭ এবং যত বালিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মধ্যে ১,৫৮,১০২টি এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত

হইয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বালক ও বালিকা উভয়ে মিলাইয়া এক বৎসরের কম বয়স্ক মোট শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ৩৩৯,৬৪৯। লোক সংখ্যা গণনায় ঐ হিসাবে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্মিয়াছিল তাহার চারিজনের একজন করিয়া ১ বৎসরের কম বয়সেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ জেলায় কত শিশু মারা গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা প্রদর্শন করিতেছি :—

জেলা	বালক	বালিকা
বর্দ্ধমান	৭২৮৮	৬৩৯২
বীরভূম	৫২৫১	৪৪৯৩
বাঁকুড়া	৫২২৯	৪৭৮০
মেদিনীপুর	৯৪২৪	৮৯৪০
হুগলী	৪০৭৯	৩৪৪৭
হাওড়া	৩১৮৬	২৬৮৭
২৪শপরগণা	৬৬১৩	৫৬০৩
কলিকাতা	২৮১২	২২৮৪
নদীয়া	৭৩৮৪	৭৩৪৭
মুর্শিদাবাদ	৭৩৫৪	৬৮৬২
যশোহর	৪৫২৪	৪১১২
খুলনা	৬৪৯৪	৫৬৪৪
রাজসাহী	৬৪৬৫	৫৮১২
দিনাজপুর	৮৩১২	৬৮৮৭
জলপাইগুড়ি	৪২১৯	৩৭১৯
দারজিলিং	১১৪৩	৯২৭
রঙ্গপুর	১১১৯২	৯৪৫৮
বগুড়া	৩৫৯৮	২৯৯২
পাবনা	৪৬১৫	৪০৩৭
মালদহ	৩৬৬৯	৩৪৮৩
ঢাকা	১২২৭৮	১০৩০৬
ময়মনসিংহ	১৭০৩৩	১৪৭১১
ফরিদপুর	৮৪৪৪	৭১০২
বাকরগঞ্জ	১১৭০২	৯৫৪৬
চট্টগ্রাম	৫৪৯৯	৪৭৮৮
নোয়াখালি	৫১৩০	৪৭৪৩
ত্রিপুরা	৮৫৮০	৬৯৯৯
	১৮১,৫৪৭	১,৫৮,১০২

এই মৃত্যু তালিকায় বুঝা যায়, পশ্চিম বাঙ্গালাতেই এই মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়াছে। বর্দ্ধমানে শতকরা ৩০,৭ বীরভূম ৩০·১, নদীয়ায় ২৯·৬ মুর্শিদাবাদে ২৮·৩ এবং কলিকাতায় ২৮·১টি করিয়া শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

এখন এই শিশু মৃত্যু যে দেশে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে ইহার কারণ কি? যে সকল নিয়মে শিশুর জীবন রক্ষা করা উচিত এখনকার প্রসূতিগণ সে সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞতা থাকাই ইহার প্রধান কারণ। শিশুরক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক প্রসূতিরই শিশুপালন করিবার প্রণালী সকল অবগত থাকা কর্ত্তব্য। অতীতযুগে আমাদের দেশের মহিলারা সকলেই বিদূষী হইতেন না,—বিদূষী হওয়া তো দূরের কথা, লেখাপড়া শিক্ষাটাও সেকালে মহিলা সমাজে বড় একটা প্রচলিত ছিলনা, কিন্তু সেকালের বয়স্থা মহিলা-গণ যে এক একজন পাকা গৃহিণী হইতেন এবং তাহারই ফলে শিশুপালনে তাঁহার বিশেষ জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন, সে কথা তো সর্ব্ববাদী সম্মত। এখন শিশুর একটু সামান্য বাল্‌সা হইলেই চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তথনকার গৃহিণীগণ শিশুর সাধারণতঃ অসুখে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণের আবশ্যকতা মনেই করিতেন না। আলুইয়ের বড়ী ছিল, তুলসীর রস ছিল ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ছিল, বিশুদ্ধ টাটকা মধু ছিল, সোহাগার খই ছিল,

মুক্তবর্ষীর পাতা ছিল,—এই সকল দিয়াই সেকালের গৃহিণীরা আপন আপন পরিবারের শিশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু তখন তো দেশে শিশু মৃত্যু এত অধিক ছিল না।

এখন ব্যয়বাহুল্যে দেশের অবস্থা শোচনীয় হইলেও দেশে অর্থ সুলভ হইয়াছে, লোকের অর্থ খরচ করিবার প্রবৃত্তিও বাড়িয়াছে সেই সঙ্গে সে কালের শিক্ষা দীক্ষা দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, শিক্ষার অভাবে সেকালের ঠানদিদির মত গৃহিণী বাঙ্গালী সমাজে আর নাই, কাজেই শিশুর সামান্য বাল্‌সাতেও এখন চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ না করিলে উপায় নাই। ফলে অনেক উন্নত অবস্থার পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা-বিভ্রাটেও অনেক শিশু অকালে পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে।

তাহার পর যে সকল নিয়মে আমাদের দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমরা স্বাস্থ্যবান হইতে পারি, দীর্ঘজীবি হইতে পারি—বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ – কাহারও সে চেষ্টা নাই। আমরা এখন বুঝিয়াছি বিলাসিতা। অনেক দরিদ্র বাঙ্গালী প্রাণপাত পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাতে কুলাইতে পারেনা, কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত আহার্য্য লাভও অনেকের ভাগ্যে জুটে না। ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের এখন যথেষ্ট অপচয় ঘটিতেছে। কাজেই দুর্ব্বল পিতৃমাতৃ শুক্রশোণিত হইতে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবী সন্তানলাভের কামনা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে? শিশু মৃত্যুর আধিক্য এজন্যও আমাদের দেশে ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে।

দেশে দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য,—দুষ্প্রাপ্য বলিলেও চলিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে দুগ্ধ আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ফলে খাঁটি দুগ্ধের অভাবে যেরূপ দুগ্ধ অধিকাংশস্থলে শিশুদিগকে এখনকার দিনে পান করান হয়, যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি সংঘটন তাহারই পরিণতি। এই যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতির জন্যই অনেক স্থলে শিশু মৃত্যু সংঘটিত হয়। আমরা 'হোমরুল' 'হোমরুল' করিয়া ব্যস্ত, কিন্তু দেশে গাভী পালনের ব্যবস্থা করিয়া খাঁটি দুগ্ধ সুলভে প্রাপ্তির কি উপায় করিতেছি? যে পর্য্যন্ত আমরা সে উপায় না করিব, সে পর্য্যন্ত দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাইবেনা—ইহা সুনিশ্চিত।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গালায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার আর একটি কারণ, পূর্ব্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গালায় বিলাসিতার প্রসার বৃদ্ধি। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজেও এই বিলাসিতাটা অধিক মাত্রায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষগণ সভ্যতার খাতিরে 'বাবু' সাজিয়াছেন, পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাগণও সর্ব্বপ্রকারে বিবিয়ানা'র পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মূর্ত্তিমতী বিলাসিনী হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের অনেক সংসারেই এখন পাচকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, দাসদাসীতে গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করে, আর মালক্ষ্মীগণ আরামকেদারায় অবস্থিতি পূর্ব্বক নাটক নবেল পাঠেই সম্যক প্রকারে মনোযোগ দিয়া থাকেন। ফলে পরিশ্রমের প্রথাটা পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজ হইতে অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাদিগের অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের পীড়ার উৎপত্তির ইহাই কারণ। ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাগণ সর্ব্ব প্রকারে যতটা অস্বাস্থ্যবতী,—পূর্ব্ব বাঙ্গালার মহিলারা তত নহেন। পূর্ব্ব

বাঙ্গালার পুরুষেরাও পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষদিগের অপেক্ষা কর্ম্মঠ, কাজেই স্বাস্থ্যবান। পশ্চিম বাঙ্গালার পিতৃমাতৃ শুক্রশোণিতের ফল সম্ভূত শিশুগণের মৃত্যু এই জন্যই অধিক হইয়া থাকে।

ইহার উপর কন্যার বিবাহে যৌতুক প্রদানে উৎপীড়ণের ব্যবস্থা পশ্চিম বাঙ্গালার সকল জাতির মধ্যেই যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এখনও সেরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। সেই পণ পীড়ণের ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসী দিগকে অনেক সময় সকল দিক চিন্তা করিবার অবসর না রাখিয়াই কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য যতটা রাখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, অনেক সময় পশ্চিম বাঙ্গালার কন্যার পিতা অবস্থার ব্যবস্থায় তাহা রক্ষা করিতে পারেন না, পাত্রের পিতার পক্ষেও পণ পাইলেই হইল, তিনিও অতটা বিচার করিতে চাহেন না; কাজেই পরিণয় ব্যাপারে বাঙ্গালার পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে অধিকাংশ স্থলে উপযুক্ত মিলন অসম্ভব হইয়াপড়ে। এই বয়ঃবিচার রক্ষা না করিয়া স্ত্রী পুরুষের মিলন করিয়া দেওয়ার জন্যও দেশে শিশু মৃত্যুর পরিমাণ আমরা বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছি।

হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ দিবার প্রথা বরাবরই আছে, এখন কন্যাপণের জন্য তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। যাহা হউক হিন্দু শাস্ত্রে বাল্যবিবাহ চির প্রচলিত হইলেও পূর্ব্বে যখন তখন স্ত্রী পুরুষের মিলন কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না। পুরলক্ষ্মীগণ স্বামীর মুখ তো দিবাভাগে দেখিতেই পাইতেন না, সকল নিশাও তাঁহাদের আরামের কাল হইত না। এক কথায় তিথি নক্ষত্র দেখিয়া, পর্ব্বদিন বাছিয়া সেকালে স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিল, এখন সে ব্যবস্থাও যে উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালার শিশু মৃত্যুর আধিক্যের ইহাও একটা কারণ।

ফলে দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল শিশু জীবন রক্ষার জন্য দেশের সকল মনীষীগণেরই চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশে আবার পাকা গৃহিণী তৈয়ার করিবার আবশ্যক। শিশু জীবন রক্ষা করিবার জন্য দেশের পুরুষদিগেরও রুচি পরিবর্ত্তন যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতেও সন্দেহ নাই।

কো২রুক?

—::—

(ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার)

কঃ—অরুক্? কে রোগ ভোগ করে না? অর্থাৎ কাহার শরীর নীরোগ?

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে লোকমঙ্গলজনক মনোমুগ্ধকর এবং হিতোপদেশ মূলক একটি গল্প আছে। সে গল্পটি এইরূপ যথা—

কোন এক নির্জ্জন বনবাসী ঋষি একদা

স্বীয় আশ্রম তরুতলে নিবিষ্ট চিত্তে ভগবৎ ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটি সুন্দর বন বিহঙ্গ উড়িয়া আসিয়া আশ্রমতরুর একটি ক্ষুদ্র শাখার উপরে ঠিক সেই ঋষির সম্মুখবর্ত্তী স্থানে বসিয়া মধুরস্বরে গাহিল—

কোহরুক ?

পাখী স্বীয় স্বাভাবিক গান গাহিল, সে গানের অর্থ কি তাহা পাখী বুঝিল না। কিন্তু ঋষির কর্ণ ঐ সুশব্দে চকিত হইল। ঋষি বুঝিলেন যে, স্বভাবের অঙ্কপালিত বন বিহঙ্গের এই "কোহরুক্" শব্দটির উত্তরে জাগতিক জীব সমূহের কি গুরুতর সম্বন্ধ নিহিত আছে। ঋষি বিহঙ্গের দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন—মরি ! মরি ! কি সারগর্ভ সুন্দর প্রশ্ন! কোন মহাত্মা আজ জীবদুঃখে দুঃখী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় বিহঙ্গরূপে আসিয়া আমাকে এই মহান্ প্রশ্ন করিতেছেন ? তা' ইনি যিনিই হউন তাঁহার এই মহৎ পবিত্র প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি মহানন্দিত চিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন,—

জীর্ণে হিতভুক্।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে শারীরিক ও মানসিক হিতকর আহার বিহারের সেবা করে—সেই নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবি হয়। বন বিহঙ্গ ঋষির সেকথা বুঝিল না বা তাহাতে দৃক্‌পাতও করিল না; সে আপন স্বাভাবিক সুরে আবার গাহিল

"কোহরুক্ ?"

সেই স্বর শ্রবণে ঋষিপ্রবর বিস্মিত হইয়া আবার চিন্তিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হয় নাই। কেননা, হিতকর আহার্য্য পরিমিত মাত্রায় না হইলেই তো রোগজনক হইবে। সুতরাং হিতকর দ্রব্য আহারে মাত্রাশী হওয়া আবশ্যক। তাই মহর্ষি আবার উত্তর দিলেন—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্।

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই দেহ নীরোগ থাকিতে পারিবে।

স্বভাবে চালিত পক্ষী আবার স্বভাব বশে স্বাধীনমনে গাহিল।

"কোহরুক্ ?"

মুনি ঠাকুর এবারও চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, প্রশ্নের উত্তর সম্যক দেওয়া হয়নাই। কেন না কেবল পরিমিত হিতাহারেই জীব রোগহীন থাকিতে পারে না। ভুক্তবস্তু পরিপাকের জন্য তাহার যথোপযুক্ত পরিশ্রম করা প্রয়োজন। তাই তিনি আবার পাখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক শ্রমোপভুক।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীর্ণে হিতবস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করে এবং তাহার সহিত যথা সময়ে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমে রত থাকে, সে নিশ্চয়ই নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ হয়।

বনচারী পক্ষী আপন মনে স্বাধীন ভাবে নিজ স্বাভাবিক সঙ্গীতে রত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে—সে তো আর তাঁহার বুলির অর্থ জানে না যে, ঋষির সদুত্তর লাভে নিরস্ত হইবে, সে আনন্দে আবার ডাকিল—

"কোহরুক ? কোহরুক ?"

ঋষি তখন বিজ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ করতঃ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে, বাস্তবিকই প্রশ্নের উত্তর এখনো হয় নাই। কেননা স্বরশাস্ত্রে আছে;—

ভুক্ত মাত্রেণ মন্দাগ্নৌ * * *।
শয়ণ সূর্য্য বাহেন কর্ত্তব্যস্ত সদা বুধৈঃ॥
(স্বরোদয়)।

আহারের পরবর্ত্তী মন্দাগ্নির প্রতীকারার্থ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবহন কর্ত্তব্য। এই রূপ শ্বাস বহাইবার কৌশল বামপার্শ্বে শয়ন। আবার আহার করার পর শয়ন করা নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতেও পরিপাক শক্তির লাঘব হয়, এজন্য শতপদ ভ্রমণান্তে বামপার্শ্বে শয়নই সুচারু পরিপাকের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ঋষি বলিয়া উঠিলেন—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।
শত পদ গামী বাম শায়ীচ॥

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত ভোজী ও শ্রমশীল ব্যক্তি যদি আহারান্তে শত পদ ভ্রমণের পর বামপার্শ্বে শয়ন করিতে জানে, তবে সে নীরোগ থাকিবে।

বনের পাখী এ সকল কিছুই বুঝিল না সে আবার,আপন স্বরে ডাকিল,—কোঽরুক্।

তখন ঋষিবর অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, হাঁ বাস্তবিকই একটি কথা এখনও বলিতে বাঁকি আছে—তাই তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন।—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।
শত পদগামী বাম শায়ীচ॥
অবিজীত মূত্র পুরীষী খগেন্দ্র।
সোঽরুক্ সোঽরুক্ সোঽরুক্॥

অর্থাৎ হে খগেন্দ্র! যে ব্যক্তি জীর্ণান্তে হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করতঃ পরিশ্রমশীল ভাবে জীবন কাটায় এবং আহারান্তে শতপদ ভ্রমণান্তর বামপার্শ্বে শয়ন করে, আর কদাচ মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, সে নিশ্চয় নিরোগী হয়, নিরোগী হয়, নীরোগী হয়।

তখন বিহঙ্গমটি স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নিবন্ধন অন্যত্র উড়িয়া প্রস্থান করিল। তাহাতে ঋষিবরও প্রশ্নের উত্তর শেষ হইয়াছে জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। *

---

* উক্ত "কোঽরুক" বিষয়ে কেহ কেহ এরূপও ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, একদা দেব বৈদ্য ধন্বন্তরি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন, তৎকালে এক অরণ্য মধ্যে উচ্চতরুতে বসিয়া একটী পক্ষীবর স্বব করিতেছিল, "কোঽরুক্ কোঽরুক্?" তাহা শুনিয়া ধন্বন্তরি মনে করিলেন যে, পক্ষী আমাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতেছে যে, "কে অরোগী? কাহার রোগ হয় না?" তদুত্তরে ধন্বন্তরি কহিলেন,—

জীর্ণে হিতমিত ভোজী শতপদগামী বামশায়ী।
অবিজিত মূত্র পুরীষী খগেন্দ্র সোঽরুক্ সোঽরুক্ সোঽরুক্॥

অর্থ—ভুক্তাগ্র জীর্ণ হইলে যে ব্যক্তি শরীরের হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করে আর আহারান্তে শত পদ ধীর ভাবে ভ্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করে এবং মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, হে খগেন্দ্র! সেই অরোগী, সেই অরোগী, সেই অরোগী জানিবে।

উক্ত বচনে "শ্রমোপভুক্" শব্দটি নাই। বাস্তবিক শ্রমোপভুক শব্দ না থাকিলেও উক্ত বচনের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। এই নিমিত্ত আমরা পূর্ব্বোক্তভাবে উহাকে উল্লেখ করিলাম।

প্রঃ লেঃ।

এখনকার দিনে আমরা যে স্বাস্থ্য হারাইয়াছি, তাহার কারণ আমরা "কোহরুক" শব্দের অর্থ জানিনা।

চরক সংহিতাতেও স্বাস্থ্য পালন সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

মাত্রাশীস্যাৎ * * আহার দ্রব্যাণি
প্রকৃতি লঘুন্যপি মাত্রাপেক্ষীণি ভবন্তি।

মাত্রানুসারে আহার করাই নিতান্ত প্রয়োজন। আহার্য্য দ্রব্য একান্ত হিতকর অথবা স্বাভাবিক লঘু হইলেও তাহা নিশ্চয়ই মাত্রাকে অপেক্ষা করে। সহস্র হিতকর আহার্য্য বস্তুও পরিমিত মাত্রায় সেবিত না হইলে নীরোগ ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং হিতকর আহার্য্যের পরিমিত মাত্রার বিশেষ প্রয়োজন।

চরকের স্থানান্তরে শ্রমশীলতা বা ব্যায়াম সম্বন্ধেও বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যায়ামে যে শরীরের লঘুতা, কার্য্যে উৎসাহ, দেহের দৃঢ়তা, পাচকাগ্নির উদ্দীপনা, কোষ্ঠের অণুলোমতা প্রভৃতি অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা চরক সংহিতায় স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে।

অধুনা নব বিলাসিতার স্রোত দেশে আসিয়া মানবগণকে নিতান্তই শ্রম বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। এখন দুই এক মাইল পথও বিনাযানে পর্য্যটন সাধ্যায়ত্ত নাই। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই সমভাবে শ্রমবিহীনতা-শিক্ষায় পরিপক্ক হইয়াছেন। নব্য সভ্য সমাজে পরিশ্রম কার্য্যটা নিতান্তই অসভ্যতা জ্ঞাপক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া ভারতীয় নরনারীকে নবভাবে অসম্বন্ধ আলস্যে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে। দেশের শোচনার অবস্থা ইহারই ফলসম্ভূত। দেশের লোক এ সকল কথা বুঝিবেন কি ?

সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যতা আছে কি না।

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর

(কবিরাজ শ্রী·········বন্দ্যোপাধ্যায়)

চরকে মদ্যকে বিষের সহিত উপমা করা হইয়াছে ; বিষ যেমন সুস্থ দেহে হিতকর নহে, পরন্তু সমূহ অহিতকর, মদ্যও সেইরূপ সুস্থ দেহে হিতকর নহে, বরং অহিতকর বা ইহাই চরকের কথা।

বিষের ন্যায় মদ্যের দশটী গুণ ও আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যথা লঘুতা, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, সূক্ষ্মতা, অম্লতা, ব্যয়াথিতা, আশুগামিতা রুক্ষতা, বিবাশিতা (যাহা ধাতুসম্বন্ধ শিথিল করে) ও বিশদতা (পিচ্ছিলের বিপরীত) আবার শরীরে যাহা ওজঃ থাকে তাহার গুণ ও দশটী, যথা, গুরুত্ব, শৈত্য, মৃদুত্ব, শ্লক্ষ্ণত্ব, ঘনত্ব, মাধুর্য্য, স্থিরত্ব, নির্ম্মলত্ব, পিচ্ছিলত্ব এবং স্নিগ্ধত্ব। মদ্যের দশটী গুণ দশটী গুণের বিরোধী বলিয়া বলের নাশ করিয়া থাকে। মদ্যের লঘুত্ব দ্বারা বলের গুরুত্ব, উষ্ণতা দ্বারা শৈত্য, অক্ষমতা

দ্বারা মাধুর্য্য, আশুগামিত্ব দ্বারা প্রসাদ গুণ, রুক্ষতা দ্বারা স্নিগ্ধতা, ব্যবায়ি গুণ দ্বারা স্থিরতা বিবাশিতা গুণ দ্বারা শ্লক্ষ্ণতা, বিষদ গুণ দ্বারা পিচ্ছিলতা এবং সূক্ষ্মতা বশতঃ ঘনত্ব গুণ নষ্ট করিয়া থাকে'। যাহা শরীরের সার পদার্থ ও দেহের বল নষ্ট করিয়া থাকে তাহা কি প্রকারে সুস্থ শরীরে হিতকর হইতে পারে?

মদ্যের গুণ ও দোষের আলোচনা করিয়া সুস্থ শরীরে মদ্য হিতকর নহে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ মদ্য পান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বাগভট সদাচার প্রসঙ্গে সুরাপান এবং মদ্যাতিশক্তি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুরাপান যখন নিষেধ করা হইল, তখন মদ্যাতিশক্তি নিষেধ করিবার সার্থকতা কি? সুরাপান নিষিদ্ধ কিন্তু যদিই কদাচ কর তবে অতিরিক্ত আসক্ত হইও না। গ্রীষ্মকালে মদ্য পান করা উচিত নহে, কিন্তু যদিই খাও, তবে আসল মদ্য প্রচুর জল মিশাইয়া খাইবে। সুরাপান নিষিদ্ধ, কিন্তু যদিই সুরাপান কর, প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্য সহ খাইবে। সাধারণের হিতার্থ শাস্ত্রকারগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

চরক সূত্রস্থানে সদাচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মদ্য, দ্যূত (জুয়া) ও বেশ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবে না।

চরক এবং বাগভট উভয় গ্রন্থেই মদ্যের সুস্থশরীরের অনুপযোগীতা সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায় যথা :—

উভয় গ্রন্থেই এইরূপ লিখিত যে, মদ্য যে ব্যক্তি পান না করে, সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং সে ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করে; তাহাকে শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল স্পর্শ করিতে পারে না।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অল্প মাত্রায়ই হউক আর অধিক মাত্রায়ই হউক মদ্য পান করিলে শারীরিক ও মানসিক বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। যাহা রোগ জনক তাহা কখনই সুস্থ শরীরের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দীর্ঘ আয়ু স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য বর্ণ স্বর, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা প্রভৃতি লাভের জন্য রসায়ন ঔষধ সেবনের বিধি আছে। রসায়ন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, সত্যবাদী ক্রোধহীন, মদ্য ও মৈথুন হইতে বিরত প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষেরা রসায়নের ফল লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঔষধ সেবন ব্যতীত তাঁহারা দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মদ্য দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভের অন্তরায় স্বরূপ। সুতরাং স্বাস্থ্য আরোগ্য এবং দীর্ঘ আয়ু লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে মদ্য কখনই হিতকর হইতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল শাস্ত্রীয় অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মদ্য মনের ও শরীরের সাময়িক উত্তেজনা ঘটাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বল, সুখ,রতি শক্তি প্রভৃতির বর্দ্ধক নহে এবং উহা পরমায়ু বা আরোগ্যের অন্তরায় স্বরূপ। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তবে কি জন্য সুস্থাধিকারে অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তির আহার বিহারাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মদ্যপানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে? মদ্য যদি

সুস্থ শরীরে অহিতকরই হইল, তবে সুস্থ ব্যক্তিকে পান করিবার উপদেশ দেওয়া হইল কেন?

ফল কথা মদ্য ব্যবহারে একটা সাময়িক সুখ হয় মাত্র কিন্তু ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ ভোগ—হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অল্প সুখে বিমূঢ় মানব সেই সুখের প্রত্যাশায় মদ্য পান হইতে বিরত থাকে না। অপকারী জানিয়াও কত লোক যে মাদক দ্রব্যে অনুরক্ত হইয়া নিজের এবং অপরের জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অহিতকর মাদক দ্রব্য সেবনের প্রথা প্রচলিত আছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন ঃ—

প্রবৃত্তিরেব ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ।

অর্থাৎ মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি এইরূপ—মদ্য পানাদিতে ইচ্ছুক, কিন্তু নিবৃত্তি মদ্য পানাদি পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ।

যদি এইরূপই হয় তবে কি সেই সকল প্রবৃত্তির দাস মনুষ্যগণের হিতার্থে শাস্ত্রকারগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এই জন্যই সর্ব্বভূতে সমদর্শী অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ বক্তা ঋষিগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিধি পূর্ব্বক মদ্য পান করিলে শরীর সহজে ধ্বংস হইবে না। পরন্তু সুস্থ শরীরে হিতকর হইবে বলিয়া এরূপও বলা হয় নাই। ইহার একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যাইতেছে। চৌরকার্য্য সকল দেশে সকল সমাজে চিরদিন দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। অথচ শাস্ত্রকারেরা চৌর্য্য শাস্ত্র (অর্থাৎ কি করিয়া চুরি করিতে হয়, কোথায় কিরূপ সিঁদ কাটিতে হয়) সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি চৌরকার্য্যের প্রশংসা করা? তাহা নহে। কিন্তু তস্কর পৃথিবীতে চিরদিন ছিল, আছে এবং থাকিবে। তাহারা যতই অধম হউক, তাহাদের একটা উপায় চাই তো। সেইজন্য অধমতারণ ঋষিগণ তস্করদিগের কার্য্যসাধক উপদেশ দিতেও ত্রুটি করেন নাই। মদ্য পান সম্বন্ধে উপদেশও এইরূপ, মদ্য পান হিতকর বলিয়া নহে।

সুস্থ শরীরে মদ্য পান যে হিতকর নহে, তাহা শাস্ত্রীয় বচন হইতে প্রমাণ করা হইল। এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে মদ্য কাহাকে বলে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ও য়ুরোপীয় মদ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা দেখা উচিত।

যে দ্রব্য পান করিলে মত্ততা জন্মায় তাহাকে মদ্য বলে। আর শালি ও ষষ্টিক ধান্যের চাউল প্রভৃতি হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সুরা বলে। সুরা শব্দের ডাক্তারী নাম স্পিরিট (spirit)। আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি মদ্যকে ইংরাজীতে লিকার (liquor) বলে। বারুণী (তাড়ী, সীধু ভিনিগার—Vinegar) প্রভৃতি মদ্য শব্দ বাচ্য। য়ুরোপীয় মদ্য যত সুরাসার (Alchohol) বহুল, আয়ুর্ব্বেদীয় মদ্য তাহা অপেক্ষা অল্প। ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বপ্রকার মদ্যই য়ুরোপীয় মদ্য অপেক্ষা কম তীক্ষ্ণ (strong)।

এক্ষণে মদ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

য়ুরোপীয় চিকিৎসক সমাজ কোন কোন

স্থলে মদ্য শরীরে খাদ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে ইহাই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মদ্য শরীরের খাদ্যের ন্যায় পুষ্টি সাধন করে না, বরং বিবিধ শারীরযন্ত্রের অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকে এবং যতটুকু মদ্য পান করা যায় তাহা অবিকৃত অবস্থায় শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, ক্লোরোফর্ম্ম (Chlorofirm) বা ইথারকে (Ether) যেমন খাদ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, মদ্যকেও সেইরূপ খাদ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মদ্য পানের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ মদ্যের কতকগুলি হিতকর গুণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশও করেন। তাঁহারা বলেন যে,মদ্য শরীরকে অনেক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, অত্যন্ত শীত বা উত্তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা করে, আহার পরিপাকের সহায়তা করে, শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে, পেশী সমূহকে সবল করে, ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, মদ্য কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষেই হিতকর নয়, বরং অত্যন্ত অহিতকর। কেবল মনুষ্য বলিয়া নহে, সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই মদ্য বিষতুল্য অনিষ্টকর। মনুষ্যের প্রাণনাশক অনেক প্রকার বিষের প্রভাব যে সকল প্রাণ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, মদ্যের প্রভাবে তাহাও সহ্য করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, এমন কোন জন্তু নাই, যে জন্তু মদ্য দ্বারা অভিভূত হয় না। একটী পারাবত—যাহাতে অনেকগুলি মানুষের প্রাণ নাশ হয়—এরূপ পরিমাণ অহিফেন অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। একটী ছাগল—যাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যের প্রাণনাশ হয় এরূপ পরিমাণ তামাক অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। একটী খরগোস—যাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যের প্রাণনাশ হয়, এরূপ বেলেডোনা (Belladona) অনায়াসে সেবন করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল বিষ সেবন করিয়া অভিভূত না হইলেও, মদ্য পান করিলে উহারা মনুষ্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক উইলোর্ড পার্কার (Prof Willord Prorktur M. D.) বলিয়াছেন যে, মদ্য পান করিলে শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়, বলের হ্রাস হয় এবং শতকরা ত্রিশ ভাগ পরমায়ু কমিয়া যায়।

ডাক্তার পার্কস তাঁহার রচিত প্রাকৃটিক্যাল হাইজিন (Practical Hygenine) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মদ্যের যদি অভাব থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক পাপ ও দুঃখ রোগ ভোগ প্রভৃতি কম হইত।

আমেরিকার চিকাগো মহানগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার জে, কে, রসি ও চেলার এবং এফ্., এফ্., রসি ও চেলার বলিয়াছেন যে, অনেকে ইচ্ছা পূর্ব্বক এই বিষ পান করিয়া যে কেবল শারীরিক যন্ত্র সমূহের স্বাভাবিক কার্য্যের বিঘ্ন ঘটায় তাহা নহে, পান করিয়া শীঘ্রই মৃত্যুকে আহ্বানও করিয়া থাকে। আবার ইহা কেবল যে শরীরকে নষ্ট করে—তাহাও নহে, পরন্তু মৃত্যু হইতেও অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া মনের শান্তিকে নষ্ট করে, হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে, পরিবার-

বর্গকে দারিদ্র্য ও দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে এবং তাহাদিগকে জীবনের কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। যতদিন মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া না দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত রোগ-যন্ত্রণা মদ্যপায়ীর নিত্য সহনীয় হইয়া থাকে।

বিট্রিশ মেডিকেল জর্ণ্যাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মদ্য ব্যবহারে জীবনী শক্তি (vitality) বর্দ্ধিত হয় না, পরন্তু কমিয়া যায়।

মদ্য যে কেবল মদ্যপায়ীরই অনিষ্ট করে তাহা নহে। পিতা মাতার পাপের ফল পুত্র কন্যাও ভোগ করিয়া থাকে। ডাক্তার হাউয়ে (Mr. Howey) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, সুইডেন এবং য়ুরোপের অর্দ্ধেক জড় (Idiot) ব্যক্তি মদ্যপায়ী পিতামাতার সন্তান।

লর্ড শ্যাফ্‌ট্‌স্‌ বরি (Lord Shaftosbury) ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভায় যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে দশ জন উন্মত্তের মধ্যে ছয়জন মদ্যপানের ফলেপাগল হইয়া থাকে। ডাক্তার উইলাড পার্কার, ডাক্তার বেঞ্জামিন রস, ডাক্তার হাউয়ি প্রভৃতি চিকিৎসকগণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

ডাক্তার এড মণ্ডস, পার্কার, চার্কট (Mr. Charkot of Paris) এবং ডাক্তার হল্‌ প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মদ্যপানের প্রকৃতি পিতা অপেক্ষা পুত্রের অধিকতর প্রবল হয়। মদ্যপায়ীর পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর মদ্যপায়ী এবং রোগগ্রস্ত হয়। ক্রমশঃ বংশের বিষম অধঃপতন ঘটে।

ডাক্তার এণ্ডারসন, এম হিউবার, ষ্ট্যানলি, ডাক্তার কার্পেণ্টার (Dr. W. B. Carpenter) প্রমুখ চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলেন যে, মদ্য পানের ফলে শরীর সহজেই রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়ে। মহামারীর (Epidemic) সময় মদ্যপানরত ব্যক্তিগণই অধিক সংখ্যায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যাহারা মদ্যপান করে না তাহাদের রোগ মদ্যপায়ী অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে হয়।

ডাক্তার স্মিথ চেম্বারস, জেমস্‌ মিলার, কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণ বলেন যে, অপরিমিত মদ্যপানে যেরূপ অনিষ্ট হয়, পরিমিত মদ্যপানেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

মদ্যপানে কেবল শরীরেরই অনিষ্ট হয় না, পরন্তু মনেরও অনিষ্ট হয়, চরিত্রও অত্যন্ত দূষিত করিয়া থাকে, ডাক্তার ফাথার জিল (Dr. Futhirgill) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বলেন যে, মদ্যপান দ্বারা চরিত্র যে কত দূর দূষিত হয় তাহার সীমা নাই। জগতে এমন কোনো পাপ নাই—যাহা মদ্যপায়ী দিগের দ্বারা কৃত না হইতে পারে। ডাক্তার নট (Dr. Nott) ডাক্তার এলিসা হ্যারিস (Dr. Elisha Harris) প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এবং বিখ্যাত বিচারকগণ স্থির করিয়াছেন যে. অধিকাংশ অপকার্য্যই মদ্যপায়ীদিগের দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে।

মদ্যের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মদ্য সুস্থ শরীরে অনুপযোগী, পরন্তু বিষবৎ অহিতকর। মদ্য যে বিষ—তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে।

সুস্থ শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগিতা আছে

কিনা এ প্রবন্ধে তাহাই আমাদের আলোচ্য। সুতরাং রোগ সম্বন্ধে মদ্যের উপযোগিতা কিরূপ তাহা বলা অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে হইতেছে যে, মদ্যের রোগনাশকতা শক্তিও পাশ্চাত্য চিকিৎসক গণ স্বীকার করেন না। অধ্যাপক মিলার Prof Miller M. D. of Scotland) বলিয়াছেন, সুরা দ্বারা কোন রোগ ভাল হয় না (Alchohol cure bothing)। ডাক্তার হিগিনবটম (Dr. Higgin vottom) বলেন যে, আমি সুরা প্রয়োগ করিয়া কোন রোগ ভাল হইতে দেখি নাই। ডাক্তার জনসন্ বলেন যে, ঔষধ হিসাবে সুরার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিছুকাল পূর্ব্বে দুই সহস্র ইংরাজ ডাক্তার একমত হইয়া প্রচার করেন যে, ঔষধ হিসাবে সুরা প্রয়োগ করা উচিত নহে।

মদ্যপান হেতু সুস্থ শরীর বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। শরীরে এমন কোন যন্ত্রণাই নাই মদ্য পান বশতঃ দুর্ব্বল ও পীড়িত হয় না। অতএব সুস্থদেহে মদ্য ব্যবহার কথনই কর্ত্তব্য নহে।

(ক্রমশঃ)

কলেরা কি বিসূচিকা ?

—:*:—

(কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্র নারায়ণ সেন)

কলেরা বা ওলাউঠাকে সর্ব্ব সাধারণে কেন, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও নিঃসঙ্কোচে বিসূচিকা নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কলেরাকে বিসূচিকা না বলিয়া, অতিসারের পর্য্যায় ভুক্ত করিলে কি সঠিক আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাম দেওয়া হয় না? অতিসারের ডাক্তারী নাম "ডাইরিয়া"। ডাইরিয়ারই অবস্থা ভেদ কলেরা, তদ্রূপ অতিসারের অবস্থান্তরের নাম কলেরা।

এই রোগ চেনা অতি সহজ। অন্য কোন রোগে এরূপ লক্ষণ সমূহ হয় না। চাল ধোয়া জলের মত স্বচ্ছ ভেদই ইহাই প্রধান বিনিশ্চয়ক লক্ষণ; এবং রোগীর এরূপ লক্ষণ থাকিলেই আমরা কলেরা বলিতে পারি। প্রথমে অতি প্রচুর পরিমাণে ভেদ; তৎপরে ভেদের উপর বমি, খালধরা, পিপাসা, দাহ, ভ্রম, বলহানি শ্বাস, নাড়ী বসিয়া যাওয়া, অঙ্গের শীতলতা অত্যন্ত অবসাদ, স্বরভঙ্গ ও স্বরক্ষীণ হওয়া, মূত্রহীনতা, বিবর্ণতা, চক্ষু কোটরগত, এবং পরবর্ত্তী কালে জ্বর,—এই রোগে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। এই রোগে রোগীর প্রায়ই মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞান লোপ পায় না। গন্ধ বর্ণহীন ভেদ ও বমন দ্বারা রোগীর সর্ব্বশরীরস্থ বহু জলীয়াংশ বাহির হইতে থাকে। ধাতুক্ষয় হেতু রোগী প্রতি ভেদের পরই অধিক অবসন্ন হইতে থাকে; সত্বর ইহার কোনো প্রতিষেধ না হইলে, অবশেষে মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে অতিসার শব্দের অর্থ অতি

সরণ, "গুদেন বহু দ্রব সরণং অতিসারং" রসাদি দ্রব ধাতু সকল, স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া, গুহ্য মার্গ দ্বারা অতিশয় নিঃসরণ হইলে, তাহাকে অতিসার বলে। এই রোগের সংক্রান্তি যথা :—

সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধো
সকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃ প্রণুন্নঃ।
সরত্যতীবাতিসারং তমাহু
ব্যাধিং ঘোরং ষড়্‌বিধন্তং বদন্তি।"

শরীরস্থ বহু জলীয় ধাতু—(অর্থাৎ রস,রক্ত, স্বেদ মেদ, মজ্জা, কফ, পিত্ত, মূত্র, জল প্রভৃতি ধাতু) প্রদুষ্ট হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং বায়ু কর্ত্তৃক অধোদেশে প্রেরিত হইয়া গুহ্যমার্গ দ্বারা অত্যন্ত নিঃসারিত হয়, ইহাকেই অতিসার কহে। অতিসারের বহু দ্রবসরণ বিশিষ্ট লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগ হইতে পৃথক রূপে আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে। কলেরার বিশিষ্টতা বহুদ্রব ভেদ; বমি, খালধরা, অঙ্গের শীতলতা, তৃষ্ণা, স্বর ভঙ্গ প্রভৃতি তজ্জনিত উপসর্গ।

এই রোগে প্রথম ২।১ ভেদে শরীরস্থ— পুরীষের ক্ষয় হয়। পুরীষের ক্রিয়া শরীরের উপগুপ্ত (ধারণ) এবং বায়ু ও অগ্নিকে ধারণ। প্রচুর ভেদ দ্বারা ক্ষয় হওয়াতে, রোগী শরীর ধারণ করিতে পারে না, এবং বায়ু আধার হীন হয় এবং শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিবিধ বাত বেদনা, খালধরা, অরতি, শ্বাস, বমি, প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিয়া থাকে। অগ্নি নষ্ট হওয়ায় বিবর্ণতা, উষ্মহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মক্ষয়ে রুক্ষতা, অন্তর্দ্দাহ, আশয়দিগের বিশেষতঃ আমাশয়ের শূন্যতা, সন্ধিস্থান সমূহের শৈথিল্য, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য, নিদ্রানাশ হয়। বলক্ষয়ের ফলে হৃদ্‌স্পন্দন, কম্প, ও তৃষ্ণার প্রবলতা হয়; রক্তক্ষয়ে ত্বকের কর্কশতা, শীতানুভূতি ও শিরা শৈথিল্য হয়। মাংসক্ষয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের শুষ্কতা, রুক্ষতা, তোদ (সূচী বেধবৎ বেদনা) গাত্র সমূহের অবসাদ ও ধমনীদিগের শৈথিল্য হয়। মেদ-ক্ষয়ে সন্ধি সমূহের শূন্যতা, রুক্ষতা প্রভৃতি, মজ্জাক্ষয়ে পর্ব্বভেদ, অস্থিতোদ ও অস্থি সমূহের শূন্যতা,-শুক্রক্ষয়ে অধিক, বলহানি ও মৃত্যু; স্বেদক্ষয়ে, ত্বকশোষ, স্পর্শ-বৈগুণ্য ও রোম-কূপের স্তব্ধতা উপস্থিত হয়। মূত্রক্ষয়ে বস্তি-তোদ ও মূত্রহীনতা হয়। ওজঃ বা বলক্ষয়ে, মূর্চ্ছা, মোহ, প্রলাপ অজ্ঞান, ক্রিয়া সমূহের হীনতা, ও অবসাদপ্রাপ্তি, দোষের নির্গম, গ্লানি, অঙ্গের স্তব্ধতা ও বিবর্ণতা, তন্দ্রা ও মৃত্যু হয়। রোগীর যতই ভেদ ও বমি অধিক হইতে থাকে, ততই ধাতু সমূহ অধিক ক্ষয়িত হয়, ক্রমে উপরোক্ত ক্ষয়জনিত লক্ষণ সকল প্রবলতর হয়। ধাতু ক্ষয় হেতু বায়ুর উপদ্রব দ্বারা রোগী অধিক কাতর হয়। অবশেষে বায়ু স্বয়ং ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, রোগী বাক্যহীন ও চেষ্টাহীন হয় ও মূঢ় সংজ্ঞা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কলেরায় শরীরের আর আর ধাতু (জলীয়াংশ) ক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়। ডাক্তারিতে salin injection (সেলাইল ইঞ্জেকশন) চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা অনেক সময় তাঁহারা বিশেষ সুফল পান। তদ্বারা কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শরীরোপযোগী জল, শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শরীরের জলীয়াংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

কলেরা রোগ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিদোষজ অতিসার—ইহা কৃচ্ছ্র সাধ্য বা অসাধ্য ব্যাধি।

ইহা কোন স্থলেই সুখসাধ্য নহে। বিশেষতঃ "ঘোরং যড় বিধং তং বদন্তি"—ছয় প্রকার অতিসারই 'ঘোরং' এই বিশেষণ দ্বারা রোগের ভয়ঙ্করত্ব প্রকাশ করিতেছে।...ভৈরবং। দারুণং ভীষণং তীক্ষ্ণং ঘোরং ভীমং ভয়ানকং ভয়ঙ্করং প্রতিভয়ং"—ইত্যমরঃ। কলেরা নামক ত্রিদোষজ অতিসারের বিশেষত্ব এই যে, ইহার উৎপত্তি মাত্রেই অতিসারের অরিষ্ট (মরণার্থ জ্ঞাপক উপসর্গ) লক্ষণ সমূহ দেখা দেয়, যথা বমি, স্বরভঙ্গ, উত্থাহীনতা, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ, স্বচ্ছভেদ এবং সূচীবেধবৎ বেদনা, অঙ্গে খাল ধরা প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জ্ঞাপক উপসর্গ সকলও প্রকাশ পায়।

"ন জীবেৎ ধাতু সংক্ষয়াৎ ইতি," ধাতু ক্ষয় হইলে মানুষ বাঁচে না। এইজন্যই কলেরায় ধাতুক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়।

ত্রিদোষজ জ্বর যেমন অনেক প্রকার এবং বিউবনিক প্লেগ—জ্বর ব্যতীত অন্য কিছু নয়, ত্রিদোষজ অতিসারও সেইরূপ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কলেরা একটি অরিষ্ট লক্ষণ সংযুক্ত প্রাণান্তকর ত্রিদোষজ অতিসার।

দোষাবস্থা স্তস্য নৈকপ্রকারা,
কালে কালে বাধিতস্তোদ্ভবন্তি।

কলেরা যখন মহামারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন দুষ্ট জল, বিষ বা ঋতু বিপর্য্যয় ইহার প্রধান কারণ হয়, তথা অতিসারে অন্য হেতু সকলও অনেক সময় কারণ হয়।

কলেরাকে বিসূচিকা বলার বিশেষ আপত্তি এই :—

নতাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাশমাঃ।
মূঢ়া স্তামজি তাত্মনো লভন্তে শনলোলুপাঃ।

কিন্তু কলেরার পক্ষে এ কথা আদৌ খাটে না। জিতাত্মন, পরিমিতাহারী হইলেই কলেরার সংক্রামকতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু বিসূচিকা পরিমিতাহারীর হইবে না, ইহা হইল আয়ুর্ব্বেদের বৈশেষিক সূত্র।

বিসূচিকা—অজীর্ণান্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অজীর্ণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া সূচি সহযোগে সর্ব্বগাত্র পীড়ন করিতে করিতে অবস্থান করে, এইজন্য এই রোগের নাম বিসূচিকা। কিন্তু কলেরা—অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইতেও পারে, না হইতেও পারে, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কিন্তু বিসূচিকা—অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মত। কারণ বিষ্টব্ধ, বিদগ্ধ বা আমাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা উৎপন্ন হয়। কলেরায় প্রথমে ভেদ, তৎপরে ধাতুক্ষয় জনিত অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। বিসূচিকায় পূর্ব্বে অজীর্ণ জনিত বেদনা তৎপরে অতিসার ঘটে। বিসূচিকা—অতিসারের নিমিত্ত হয় মাত্র।

"স্নেহাজীর্ণ নিমিত্তস্ত বহুশূল প্রবাহিকা।
বিসূচিকা নিমিত্তস্ত চান্যোঽজীর্ণ নিমিত্তজ।
বিষার্শ ক্রিমি সম্ভূত যথাস্বং দোষ লক্ষণঃ।"
আম পক্কং ক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়াযতঃ
অতঃ সর্ব্বাতি সারাস্ত জ্ঞেয়া আমপক্ক লক্ষণৈঃ
(সুঃ—উ ৪০ অঃ)

উক্ত বচন হইতে প্রমাণ হয়—অজীর্ণ, ক্রিমি, অর্শ প্রভৃতির ন্যায় বিসূচিকা অতিসারের নিমিত্ত মাত্র—ইহা স্বয়ং অতিসার জাতীয় কোন ব্যাধি নয়, সুতরাং কলেরা নয়,—হয়ত কোন কোন স্থলে বিসূচিকা অতিসার বা কলেরায় নিদানার্থকারী হইতে পারে।

বিসূচিকা চিকিৎসার ক্রমশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে,—

সাধ্যা সুসাধ্যোর্দ্ধহনং প্রশস্ত
মগ্নিপ্রতাপনং বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং।

পক্কে ততোহন্নে তু বিলঙ্ঘনং স্যাৎ
সম্পাচনঞ্চাপি বিরেচনং বা।

কলেরায় বিরেচন ঔষধ কোন চিকিৎসক প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু বিসূচিকায়

কটুত্রিকং বা লবনৈরুপেতং পিবেৎ
স্নুহীক্ষীর বিমিশ্রিত স্তু।

মনসা ক্ষীরের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ বিরেচন ও বিসূচিকার চিকিৎসায় উক্ত আছে। কলেরায় স্নুহীক্ষীরের ন্যায় বিরেচন ঔষধ কখনও কোন অবস্থায় চলে না। তৎপরে "বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং"—ইহাও কুত্রাপি কলেরায় প্রয়োগ হয় না।

"বিশুদ্ধ দেহস্য হি সদা এব
মূর্চ্ছাতিসারাদি রূপৈতি শান্তিং।"

বিসূচিকায় রোগীর বমন বিরেচন দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে, মূর্চ্ছা অতিসার প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু কলেরায় তৎ বিপরীত রোগের স্বভাব বা প্রভাব বমন ও বিরেচনই এই রোগের সর্ব্ব প্রধান আতঙ্ক।

বিসূচিকা অজীর্ণায় হইতে উৎপন্ন হয়। কুপিত অন্ন শল্যরূপে দেহে অবস্থান করে, বমন-বিরেচন দ্বারা দোষের শুদ্ধ হইলে, রোগী শান্তি পায়। কিন্তু কলেরায় যত ভেদ বেশী হয়, রোগীও তত অধিক অবসন্ন হয়, উপসর্গেরাও ক্রমে অধিক ভাবে প্রকাশ পায়। কলেরায় যে বমি দেখা যায়, তাহা অতিসারের অরিষ্ট লক্ষণসমূহের অন্যতম—ইহা অজীর্ণ জনিত নহে, ব্যান ও উদান বায়ুর হেতু-বিশেষ ইহাতে প্রকাশ পায়।

কলেরায় শীতলতা ও উষ্মাহীনতা একটি প্রধান অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ রূপে দেখা দেয়, কিন্তু, বিসূচিকার লক্ষণ সমূহ মধ্যে উক্ত লক্ষণদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। অতিসারে অরিষ্ঠ লক্ষণ সমূহ আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে।

যে জন্যই অতিসার উৎপন্ন হউক না কেন, অতিসারে আম ও পক্ক ভেদে দুইরূপ চিকিৎসা ভিন্ন অন্যরূপ চিকিৎসা নাই। আমে পাচন, পক্কে স্তম্ভন। কিন্তু কলেরার ন্যায় আশুপ্রাণান্তকারী অতিসারের চিকিৎসা সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ বিধি আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

ক্ষীণধাতুবলাতস্য বহু দোষাতিনিস্রুতঃ।
আমেঽপি স্তম্ভনীয় সাৎ পাচনাস্মরণং ভবেৎ।

যাহার ধাতু ও বল ক্ষীণ হইয়াছে এবং ভেদ দ্বারা বহু দোষ নিঃসৃত হইয়াছে, এইরূপ অতিসারের রোগীকে আম অবস্থাতে ও স্তম্ভন ঔষধ দিবে, কেবল পাচন ঔষধ দিলে রোগীর মৃত্যু হইবে। এই অবস্থায় পাচন, স্তম্ভন ঔষধই ব্যবস্থা। কলেরায় অক্ষেপ্য "আমে'পি স্তম্ভনীয় সাৎ", নচেৎ দোষ অতিনিঃস্রুত হইয়া সরণ হইবে।

উপসংহারে ব্যক্তব্য এই যে, কলেরা নামক রোগকে আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় বিসূচিকা না বলিয়া অতিসার বলিলে অধিক শোভন হয় এবং আয়ুর্ব্বেদসম্মত নাম হয়। যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, কলেরা চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদে অতিসার চিকিৎসার ক্রম অনুসরণীয়, তখন ইহাকে বিসূচিকা বলার তাৎপর্য্য কি? আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণের নিকট আমার ইহাই নিবেদন এবং আচার্য্যগণের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য, আয়ুর্ব্বেদের মতে কলেরা বিসূচিকা কিনা তাঁহারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার মীমাংসা ভঞ্জন করিয়া দিন।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।

—:*:—

বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতেছে তাহা ১৯১৮ সালের সরকারি বিবরণী দৃষ্টে বিশেষ রূপ অবগত হওয়া যায়। ১৯১৮ খৃঃঅব্দে একমাত্র জ্বরে ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই বাঙ্গালা দেশের লোকক্ষয় হইয়াছে ৪,৭৫,১৩৫ জন। ইহার মধ্যে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোকের মৃত্যুই অধিক হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা ১৪,৮৯,১৩৫। ১৯১৭ খৃঃঅব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা হইয়াছিল ১৬,২৭,৮৭৩ সুতরাং ১৯১৭ খৃঃঅব্দ অপেক্ষা ১৯১৮ খৃঃ অব্দে জন্ম সংখ্যা ১,৩৮,৭৩৮ পরিমাণে কম হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে মৃত্যুসংখ্যা ১৭,২৭,৩৩১। ১৯১৭ খৃঃঅব্দে মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছিল ১১,৮৭,৫০৯। এই হিসাবে মৃত্যু সংখ্যা ও ১৯১৭ খৃঃঅব্দ অপেক্ষা ৫,৩৯,৮২২ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একদিকে জন্ম সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, অন্য দিকে মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে। বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা চিন্তাশীলগণ বিবেচনা করিবেন।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে যে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৪,৭৫,১৩৮ ও কলেরায় ৩৭,৩৫৮ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। কলেরা রোগে সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার লোকই অধিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃ অব্দে শিশুমৃত্যুর পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। শিশু ভিন্ন, বালক-বালিকা, যুবক যুবতীও বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণে কালকবলিত হইয়াছে, তাহাও চিন্তার বিষয়। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৪৫,০২৭ এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা ৩৪,৪৫৪। ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৫১,০১৫ ও ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ৬১,৯৭৩। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ১,১০,৪৮৫ এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ১,২৮,০৩২। ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের মৃত্যুই বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফল কথা, শিশুমৃত্যুর মত যুবতী-মৃত্যুও দেশে যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কখনই আশাপ্রদ নহে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সেই যে সন্তানের জননী হইয়া থাকেন, শিশু এবং যুবতী-মৃত্যুর অনেকটা কারণ তাহাই। অনেক মহিলা অকালে গর্ভবতী হইয়া প্রসব করিবার পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিতা হন, অনেকে উহারই ফলে রক্তাল্পতা নিবন্ধন প্রসবের পরই অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, বাল্য বিবাহ বঙ্গ দেশে চির প্রচলিত, কিন্তু বিবাহ হইল বলিয়াই অকালে বা যখন তখন স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে ছিল না। হিন্দুর গর্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি কার্য্যের

অনুষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন সে গর্ভাধান-পুংসবনের ব্যবস্থা কয়জন রক্ষা করিয়া চলেন? সে তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থাও দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সে কালে ঋতুমতী স্ত্রীর ঋতু কালে স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিবার অধিকার ছিল না, এখন সে বাছ বিচারই বা কয়জনের সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়? বালিকা ও যুবতী মৃত্যুর আধিক্যের ইহাই প্রধান কারণ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত এবং কলেরা রোগ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃই বাড়িতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনর ডাঃ বেণ্টলী ইহার কারণ নির্দ্দেশে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর আহার ও পরিচ্ছদের অনটনের কথা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, সামান্য খাদ্য এবং বস্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে লোকের জীবনী শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ইনফ্লুয়েঞ্জা ও জ্বররোগের মৃত্যুর সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে বাড়িয়া গিয়াছে।” আমরা বলি, অন্নবস্ত্রের কষ্টে বাঙ্গালা দেশে এক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগই বাড়ে নাই; এই দুইটি বিষয়ের অভাবে বাঙ্গালীর সকল রোগই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনকার দিনে যক্ষা রোগের যে এত প্রাবল্য, ইহার কারণও বাঙ্গালীর দারুণ অস্বচ্ছলতা। বাঙ্গালী আগের অপেক্ষা এখন অর্থের মুখ বেশী দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু সে অর্থে সকল দিক বজায় রাখিতে হইলে বাঙ্গালীর যে কুলাইবার উপায় নাই। দারুণ অভাবগ্রস্ত বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ইহারই জন্য।

স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, দার্জ্জিলিংয়ে যক্ষারোগে মৃত্যু সংখ্যা বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা ১৯১৮ সালে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্জ্জিলিং তো স্বাস্থ্য-গৌরবে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে প্রধান, সেখানে যে যক্ষারোগে এত বেশী মৃত্যু হইয়াছে, ইহা কি বাঙ্গালীর অর্থ কৃচ্ছ্রতার পরিচায়ক নহে? দার্জ্জিলিংয়ে থাকিতে হইলে বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে, অথচ চাকরি সূত্রে অনেক বাঙ্গালীর সেখানে অবস্থিতি না করিলে নয়। ফলে দার্জ্জিলিং প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই উপার্জ্জনের তুলনায় ব্যয়ের সংকুলান করিতে পারেন না। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশীর পরিণাম নিদারুণ দুশ্চিন্তা। দার্জ্জিলিংয়ে যক্ষারোগের প্রাবল্য সেই নিদারুণ দুশ্চিন্তারই ফলসম্ভূত।

ঢাকা ও খুলনা জেলায় আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যেও যে ঢাকা ও খুলনা জেলার আত্মহত্যার ব্যাপারে অভাবের কারণ নাই, এমন কথাও বলা যায় না।

নদীয়া, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জলপাইগুড়ি, রাজসাহি, ঢাকা, ২৪ পরগণা মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও যক্ষারোগে মৃত্যু-সংখ্যা কম নহে।

মফঃস্বলের সহরগুলিতে মৃত্যু সংখ্যা কিছু কম বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ডাঃ বেণ্টলী বলিয়াছেন,—“মফঃস্বলের সহরগুলিতে যে মৃত্যুর সংখ্যা কম বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, ঐ সমস্ত স্থানে মৃত্যু-সংখ্যা রেজেষ্টারি করার উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হয় না। মফঃস্বলের সহরগুলিতে

কলিকাতা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মফঃস্বলে কলের বৃদ্ধি উপলক্ষে ডাঃ বেণ্টলী মফঃস্বলে পানীয় জলের অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। মাদারিপুর এবং নোয়াখালির কথা এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মাদারিপুর ও নোয়াখালি কেন, বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই এখন জল কষ্ট। সেকালের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী সকল সংস্কারাভাবে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ ভাগীরথির তীরে অবস্থিত হইলেও অনেক স্থানেই গ্রামের সান্নিধ্য হইতে ভাগীরথি বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। নদীয়ার শান্তিপুরের কথা এই প্রসঙ্গে আমরা উত্থাপন করিতে পারি। বর্ত্তমান সময়ে শান্তিপুরের জন সাধারণ যেখানে বাস করিয়া থাকেন, সেখান হইতে বহুদূরে গঙ্গার ঘাট অবস্থিত। শান্তিপুরে সকল অধিবাসীই আর এই কারণে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিবার অবসর পান না, অনেকেই গঙ্গাহীন স্থানের মত কূপের জলে স্নানসুখ উপভোগ করিয়া থাকেন।

ফল কথা পল্লীগ্রামে জলকষ্ট যে নানারূপ রোগের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলেরার কথা কেন, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত—অনেক রোগই পল্লীর জলকৃচ্ছ্রতা হইতে সংক্রামক হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার জন্য পল্লীবাসী জনসাধারণের চেষ্টাশীলতা কৈ? সরকার বাহাদুর আমাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন বটে—কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা প্রসূত চেষ্টার সহিত যদি আমাদের সমবেত চেষ্টা মিলিত হয়, তাহা হইলে ইহার ফল যে শুভপ্রদ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চেষ্টা করিবে কে? আমরা যে নিদ্রিত।

বসন্তের প্রতিষেধক বিধি।

—:*:—

সংপ্রতি বাঙ্গালার অনেক স্থানেই বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় ইহার প্রকোপ তো ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এ সময় দেশের লোক যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করেন, তাহা হইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিবেন।

১। বসন্তের টীকা গ্রহণ যাঁহারা পূর্ব্বে করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য করিয়া আবারও লইবেন।

২। প্রত্যহ খাঁটি সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন।

৩। সর্ব্বদা শুচিভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ঘরে ধুনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনো ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন না।

৪। প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত দু' একটি উচ্ছে এবং উহার বীচি ভাজিয়া খাওয়ার

ব্যবস্থা করিবেন। পলতা এবং নিমপাতা ভাজা খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী। উচ্ছের স্থলে কয়োলা উচ্ছে হইলে আরও ভাল হয়।

৫। পচা এবং বাসি মাছ তো একেবারেই খাইবেন না, তা' ছাড়া এ সময় মাছ খাওয়াটা তুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। কই, শিঙ্গি, মাগুর এবং জেয়োল মাছ এ সময় একেবারেই ত্যাগ করিবেন।

৬। মাংস বা ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবেন। যাহা প্রত্যহ খাইয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক কোনো দ্রব্য এ সময় খাইবেন না।

৭। দোকান হইতে দুগ্ধ কিনিয়া পান করা এ সময় কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য এবং দুগ্ধ হইতে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হয়, এজন্য দুগ্ধ খাঁটি ও বিশুদ্ধ কিনা, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ব্যবহার করিবেন।

৮। দোকান হইতে তৈয়ারি চা কিনিয়া খাওয়ায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা অবশ্য করিয়া এ সময় উহা পরিত্যাগ করিবেন। ঐরূপ 'চা' হইতেও ইহার সংক্রমকতা আসিতে পারে।

৯। বাজারের খাবার সম্বন্ধেও যতটা পরিহার করিতে পারা যায়, ততটা মঙ্গল। থিয়েটার ও বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখার জন্য এ সময় একদিনও রাত্রি জাগরণ করিবেন না।

১০। হরীতকীর আঁটি ফুটা করিয়া সুতার সাহায্যে পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং মহিলাগণ বাম হস্তে ধারণ করিবেন। ইহা বসন্তের বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

১১। কাঁচা কণ্টিকারীর মূল চারি আনা ও গোল মরিচ ৫টা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে ২দিন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। এ মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা ঐ অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া লইবেন।

১২। বৈকাল বেলা মোচার রস দ্বারা শ্বেত চন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাসকের রস অথবা মধুদ্বারা যষ্টিমধু পেষণ করিয়া সপ্তাহে ঐরূপ ২দিন করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৩। শ্বেত পুনর্ণবার মূল চুর্ণ এক আনা ও গোল মরিচের গুঁড়া এক আনা শীতল জল সহ মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বসন্ত পীড়া হইতে পারে না।

১৪। তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাঁকুড় ও বেতস—এই কয়টি দ্রব্যের পাতার ওজন।৵১০, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া —এই ক্বাথ প্রতি সপ্তাহে ১দিন করিয়া পান করিলে কখনই বসন্ত হইবে না।

১৫। হিঞ্চেশাকের রস মধ্যে মধ্যে পান করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা শ্বেত চন্দন ঘসার সহিত মিশাইয়া—সেবনে কখনই বসন্তের আক্রমণ হইতে পারে না।

১৬। নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা —শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রতি সপ্তাহে পান করিলেও বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে পারিলে আরও মঙ্গল।

মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ।

—:•:—

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠ বিহারী গোস্বামী, ভিষগাচার্য্য।

অম্লজনিত শূল রোগের মহৌষধ।—(১) ফুলখড়িচূর্ণ ২০ তোলা, ফটকিরি চূর্ণ ৪ তোলা, সোরা চূর্ণ ৪ তোলা মৌরী চূর্ণ ২ তোলা, কাবাব চিনি চূর্ণ ২ তোলা, সাচিক্ষার চূর্ণ ২ তোলা ও কর্পূর চূর্ণ ১ তোলা—এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার দুই আনা বা তিন আনা মাত্রায় শীতল জল সহ সেবন করিলে অম্লজনিত শূল রোগ নিবারিত হয়। (২) পরিষ্কার সোরা ৮ তোলা ও পরিষ্কার ফটকিরি ২ তোলা পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া পরে মিশ্রিত করিবে। তৎপর আগুনে গলাইয়া চটি প্রস্তুত করিয়া লইবে। ঐ চটি ৫ তোলা চূর্ণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ২॥০ তোলা ও জোয়ান চূর্ণ ২॥০ তোলা দিয়া একত্র মিশাইয়া রাখিবে। ইহার তিন আনা বা চারি আনা মাত্রায় শীতল জল সহ সেবন করিলে অতি কঠিন অম্লশূল নিশ্চয় ভাল হয়।

অজীর্ণ নিবারণের উপায়।—(১) জোয়ান চূর্ণ।০ আনা সৈন্ধব লবণ ৵০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়। (২) দুই তোলা পরিষ্কার মৌরী আধ পোয়া জলে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে ২ তোলা পরিষ্কার চুণের জল ও আধ তোলা কাগজী লেবুর রস মিশাইয়া ৩।৪ বারে পান করিলে অতি সত্বর উপশমিত হয়। (৩) মুথা, আমরুল শাক ও পাথরকুচির পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া লইবে, এই রস এক কাচ্চা মাত্রায় একটু সৈন্ধব লবণের সহিত ২।৩ বার সেবন করিলে অজীর্ণ দোষ নিবারিত হয়। (৪) হিং, শুঁঠ, পিপ্পুল, মরিচ ও সৈন্ধব একত্র বাটীয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা গেলে সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

আমাশয় রোগে ব্যবস্থা।—আমরুলের পাতার রস সকালে আধ ছটাক ও সন্ধ্যায় আধ ছটাক কিঞ্চিৎ মধু সহ পান করিলে আমাশয় রোগ ভাল হয়। (২) পাকা তেঁতুল পাতা, বুড়ীপানের পাতা, থনকুড়ির পাতা, কয়েদবেলের পাতা ও দাড়িম পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া সেই রস আধ ছটাক পরিমাণে খাইলে নিশ্চয় আমাশয় রোগ ভাল হয়। (৩) কাঁটানটের শিকড় আধ তোলা, জলের সঙ্গে বাটিয়া শীতল জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ৩ কুঁচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া মিশাইয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে শীঘ্র আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

একশিরার মহৌষধ।—(১) ভেড়ার লোম ও কার্পাস তুলার বীজ—সমান

ভাগে লইয়া একত্র হামামদিস্তায় কুটিতে কুটিতে রুটীর মত হইয়া আসিলে তদ্দ্বারা বর্দ্ধিত কোষ জড়াইয়া উপরের দিকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। ৪।৫ দিন বাঁধিলেই একশিরার টন্‌টনানি বা যন্ত্রণা এবং ফুলার শান্তি হইবে। (২) হরীতকী চূর্ণ ১২ রতি, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ৬ রতি ও পিপুল চূর্ণ ৩ রতি একত্রে মিশাইয়া গরম জল সহ প্রতিদিন রাত্রিতে শয়নকালে খাইলে সকল প্রকার কোষ বৃদ্ধি কমিয়া যায়।

দাঁত ভাল রাখিবার উপায়।—হরীতকী চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, কর্পূর চূর্ণ, ফটকিরি চূর্ণ, দারুচিনি চূর্ণ, দোক্তা তামাক চূর্ণ, সুপারি চূর্ণ ও তুঁতে ভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা এবং ফুলখড়ি চূর্ণ ৮ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া রাখিয়া দিবে। এই চূর্ণ দিয়া প্রত্যহ দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইলে দাঁতের সমস্ত রোগ আরোগ্য হইয়া দন্তমূল দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে।

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন।

প্লীহা ও যকৃতরোগে।—(১) গুলঞ্চ ও খাঁড়িলবণ সমানভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া শিশুর প্লীহা ও যকৃৎ রোগে প্রলেপ দিলে উপকার হইয়া থাকে। (২) নীল ও আমের আঁটির শাঁস সমানভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া অল্প অল্প গরম থাকিতে যকৃতের উপর প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃতে উপকার দর্শে। (৩) পটোলের মূল পেষণ করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও প্লীহা ও যকৃত রোগে সুফল পাওয়া যায়। (৪) পিপুল ও যবক্ষার প্রত্যেকটি ১ রতি মাত্রায় গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ কালমেঘের রস ও মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করাইলে শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর ও শোথ রোগ আরোগ্য হয়। (৫) ক্ষেৎপাপড়ার রস এক ঝিনুক ও মধু ৩।৪ ফোঁটা—একত্র মিশাইয়া প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে শিশু-দিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (৬) নিশাদল চূর্ণ ১ রতি ও ফটকিরি চূর্ণ সিকি রতি—দুই ঝিনুক পটোল পাতার রস ও কিঞ্চিৎ মিছরি—একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের যকৃত জন্য চক্ষু ও পদাদির হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্তি ও হাত পা ফুলা আরোগ্য হয়।

রক্তামাশয়ে।—(১) গন্ধ ভাদুলিয়ার পাতার রস ১ ঝিনুক, লোধকাষ্ঠ * চূর্ণ ১ রতি ও মধু ২।৪ ফোঁটা—একত্র মিশাইয়া

* লোধ কাষ্ঠ বাজারে বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

তিন দিবস পান করাইলে শিশুদিগের প্রবল রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (২) ছাগী দুগ্ধ এক ছটাক, জল অর্দ্ধসের, মুথা ৪টি ও বেল শুঁঠ এক টুকরা—একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে রক্তামাশয় জনিত বেদনা দুরীভূত হয়। (৩) সাদাধুনার গুঁড়া অর্দ্ধ রতি ও গুড় এক আনা—কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে বালকদিগের আমরক্ত জনিত বেদনা নিবারিত হয়।

আমাতিসারে।—(১) বিড়ঙ্গ, যোয়ান ও পিপুঁল—প্রত্যেকটি ১ রতি লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইলে শিশুর আমাতিসার নষ্ট হয়। (২) বটের মূল পেষণ করিয়া চাল ধোয়া জল সহ পান করাইলে শিশুদিগের প্রবল অতিসার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্তন্যপান জনিত বমন ও হিক্কায়।—(১) চিনি, মধু ও টাবালেবুর রস একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে উপকার দর্শে। (২) বেলশুঁঠ ও জামের আঁটির শাঁস প্রত্যেকটি আধতোলা হিসাবে লইয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া, তাহাতে চিনি ও খই চূর্ণ মিশাইয়া—এক ঝিনুক এক ঝিনুক করিয়া ৩।৪ বার পান করাইলে সত্বর উপকার পাওয়া যায়। (৩) পিঁপুলের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, চিনি ও মধু—এই কয়টি দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় টাবা লেবুর রসের সহিত সেবন করাইলেও শিশুদিগের স্তন্যপানের পর বমন ও হিক্কা হইলে ফল পাওয়া যায়।

অজীর্ণে।—(১) ইসবগুল ৪ রতি ও মিছরি ২ রতি কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ভিজাইয়া প্রাতে অর্দ্ধেকটা ও বৈকালে অর্দ্ধেকটা সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিলে শিশুদিগের নাভিমূলের অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমিত মল নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হয়। বেলশুঁঠ—জলের সহিত ঘসিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

---

* খাদ্য ও স্বাস্থ্য।

(ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু)

"আমাদের খাদ্যের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ থাকা আবশ্যক। দুগ্ধ ঃপ্রকৃতিদত্ত পূর্ণ আদর্শ খাদ্য—দুধের মধ্যে পাঁচ জাতীয়, সার পদার্থ আছে। (১) ছানা জাতীয়, (২) মাখন জাতীয়, (৩) শর্করা জাতীয়, (৪) লবণ জাতীয়, (৫) জলীয়। সুতরাং দুধের মধ্যে

* শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব সভায় স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় "খাদ্য ও স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে যে উপাদেয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

যে সব সার পদার্থ আছে, শরীর পোষণের জন্য তাহাদেরই প্রয়োজন।

কিন্তু দুধ সুলভ নহে ও ক্রমাগত খাইলে একঘেয়ে হইয়া উঠে, সুতরাং আমাদের ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরিতরকারী, ফলমূল প্রভৃতি নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য হইতে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। সকল খাদ্যে এই পাঁচ জাতীয় পদার্থ একত্রে বা উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না। এই ভিন্ন জাতীয় সার পদার্থগুলির ক্রিয়া একরূপ নহে, ছানা জাতীয় খাদ্য দ্বারা শরীরের গঠন-কার্য্য হয় মাখন বা শর্করা জাতীয় পদার্থ শরীর গঠন সম্বন্ধে কোনও সহায়তা করে না। এই শেষোক্ত পদার্থ দুইটী দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি আহরণ করিয়া থাকি।

বাংলা দেশে আগে মাছ ও দুধ প্রচুর পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন আর তেমন পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাঙালী জাতির খাদ্যে ছানা জাতীয় পদার্থ খুব কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সেই জন্য ছাত্রদেব মধ্যে যথোচিত শারীরিক বিকাশ ও পূর্ণতা লক্ষিত হয় না।

দেশের অবস্থা ভাল নহে, দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য, সুতরাং ছানা জাতীয় পদার্থ খাইতে হইলে ডাল আমাদের প্রধান খাদ্য করিতে হইবে। মাছ মাংস অপেক্ষা ডালে ছানা জাতীয় পদার্থ অধিক,—সারবান এবং উপরন্তু সস্তা। ডাল সহজে পরিপাক হয় না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ডাল রীতিমত সুসিদ্ধ হইলে, তাহার মধ্যে একটীও বীচি থাকিবে না, ক্ষীরের মত ঘন হইবে, উহার জলীয় ভাগ আলাদা হইয়া থাকিবে না। ডাল একটু বেশী পরিমাণে খাইলে আমাদের খাদ্যে ছানা জাতীয়ের যে অভাব আছে, তাহা পূরণ হইয়া যায়। ডাল ভাত অপেক্ষা ডাল রুটি অধিক পুষ্টিকর খাদ্য। একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি খাইলেও ছানা জাতীয় খাদ্যের অভাব অনেকটা দূর হয়, কেননা, ভাত অপেক্ষা রুটিতে দ্বিগুণ ছানা জাতীয় পদার্থ বেশী। (শতকরা ৮০ ভাগ), ছানা জাতীয় পদার্থ মোটে ৬ ভাগ, এবং মাখন জাতীয় পদার্থ ১ ভাগের অধিক থাকে না, সুতরাং চাউল যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য নয়। চাউলে একে ত সার পদার্থ এত কম, তার উপর আবার ফেন ফেলিয়া দিলে ইহা আরো অসার হইয়া পড়ে। আমাদের এই গরীব দেশে এরূপ অপচয় একান্ত দোষাবহ। দুই একদিন অভ্যাস করিলেই যে পরিমাণ জল চাউল সুসিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজন, তাহা আমরা স্থির করিয়া লইতে পারি এবং সেই পরিমাণ জল দিয়া ভাত প্রস্তুত হইলে ফেন ভাতের মধ্যেই থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের মেয়েরা এই দিকে দৃষ্টি দিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়।

ভাত অপেক্ষা খিচুড়ি অধিক সারবান। ইহা ডাল ও ঘির সহযোগে রান্না হয় বলিয়া ইহার মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থই যথোচিত পরিমাণে থাকে। ভাতের বদলে মাঝে মাঝে খিচুড়ি খাওয়া উচিত।

ভাত—চালে শরীর-পোষণোপযোগী সার-পদার্থ আছে, কিন্তু গম প্রভৃতি অপেক্ষা কম। ইহা হজমের পক্ষে উৎকৃষ্ট। আমরা সৌখীন-তার বশে মাজা ধবধবে পরিষ্কার চালের পক্ষপাতী, কিন্তু ধানের তুষের নীচের আচ্ছা-দনের ভিতর যে একটী সার পদার্থ থাকে (vitamin) ছাঁটা চালে তাহা বাদ যায়,

ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তরায়। বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ইতর প্রাণীকে এই দু'প্রকারের চাল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাঁটা চাল খাওয়ায় তাহাদিগকে রোগে ধরিয়াছে। সুতরাং ধব্ধবে পরিষ্কার চাল খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চাল থেকে প্রস্তুত জলখাবার যথা—খৈ, চিড়ে, মুড়ি। এই তিনটাই বেশ সুপথ্য। মুড়ি শ্রমজীবিদের দু'বেলাকার খাদ্য—ইহা সুপাচ্য ও ভাতের চেয়ে সারবান্, অথচ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সব রকমের সার পদার্থ নাই, তাই ইহার সঙ্গে ছোলা বা মটর এবং নারিকেল মিলাইয়া খাইবে। এই তিনের সমন্বয়ে অতি উত্তম খাদ্য হয়। ছোলা বা মটর, ডালের কাজ করে অর্থাৎ ছানা জাতীয় জিনিসের অভাব পূর্ণ করে। নারিকেল অতিশয় স্নেহযুক্ত জিনিস, ইহা মাখন জাতীয় জিনিসের কাজ করে।

ময়দা—ময়দার রুটী ভাতের দ্বিগুণ সারবান, কারণ নাইট্রোজেন ময়দায় শতকরা ১০ ভাগ আর ভাতে ৫ ভাগ। কলে পেষা সূক্ষ্ম ময়দার ছানা ও ভুষি বাদ যাওয়াতে ইহার সারভাগ কমিয়া যায়। তাই আটার রুটী খাইবে। জাঁতা-ভাঙা খাঁটি আটা কিনিবে—অনেক সময়ে ভুষি মিশানো ময়দা আটা বলিয়া চালানো হয়। আটার রুটী স্বাদু ও উপকারী এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। হাতে গড়া রুটী ভালরূপে তৈরী না হইলে তাহার শ্বেতসার পদার্থ ভালরূপে অগ্নিপক হয় না, ইহাতে হজমের ব্যাঘাত করে। ভালসেঁক দেওয়া পাঁউরুটিতে এবং লুচিতে এই দোষ থাকিয়া যাইবার ভয় নাই, সুতরাং এ দুটীও ভাল খাদ্য এবং সুপাচ্য। কিন্তু লুচি বেশী ঘৃতযুক্ত হইলে বেহজমী হয়, ইহা স্থূলদেহ লোকদের অনুপযুক্ত।

ডাল—মসুরীর ডাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে ছানা শতকরা ২৫ ভাগ আছে। মুগ ও ও ছোলায় ইহা অপেক্ষা সার ভাগ অল্প। মুগের ডাল অতি উত্তম। অড়হর ডালের ব্যবহার পশ্চিমে খুব চলিত আছে। ইহাতে ছানা জাতীয় অংশ অপেক্ষাকৃত কম আছে বটে, কিন্তু তেমনি তাহা উদর অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে।

দুধ—ভাল দুধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য কিন্তু ইহা খাঁটি অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। ভেজাল ধরাও অনেক সময় মুস্কিল হয়। সজল দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব খাঁটি দুধের সমান করিবার জন্য তাহাতে কিছু চিনি ফেলিয়া ব্যবসায়ী লোকে ক্রেতার চোখে ধূলা দেয়।

দই—ইহা দুধের বিকার হইলেও দুধের অন্য সকল উপাদান ইহাতে আছে, কেবল চিনি নাই। দইয়ের মধ্যে যে কীটাণুর ক্রিয়ার দুধ হইতে দই প্রস্তুত হয়, তাহারা জঠরের অনিষ্টকর বীজাণু মারিয়া ফেলে। অন্ত্রস্থ এই সকল বীজাণুই রক্ত বিষাক্ত করে ও অকাল-বার্দ্ধক্যের হেতু হয়। যাহাদের বাড়ীতে দুধের অভাব নাই তাদের দুধের কিছু অংশ দইয়ের আকারে খাওয়া ভাল। ঘোল বিশেষ উপকারী। ইহা সরবতের ন্যায় পানীয়। সকালে খাবারের পর খাইলে বিশেষ উপকার হয়। আজকাল রোগীকে ঘোল খাওয়ানো হয়।

ছানা—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট সারবান খাদ্য। মাছ ও মাংসে যে ছানা জাতীয় পদার্থ থাকে, অনেক সময়ে তাহা দূষিত হয়। কিন্তু ছানায় এই দোষ ঘটে না।

মাংস—ইহা সুপাচ্য ও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু বিকৃত হইলে পরম অনিষ্টকর। খাদ্য

পশুটির নীরোগ হওয়া দরকার, বড় বড় সহরে ইহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। বেশী মাংস খাইলে শরীরে ইয়ুরিক এসিড জন্মাইয়া বাত প্রভৃতি রোগ ঘটে। তাই য়ুরোপীয়দের এই রোগ অতি প্রবল। তা ছাড়া "টোমেন্" নামক এক প্রকার তীব্র বিষ অনেক সময়ে অল্প পচা মাংসেও জন্মে। এই প্রকার মাংস আহার করা ভয়ানক বিপজ্জনক।

ডিম—অতি সারবান খাদ্য। ইহাতে ছানা প্রায় ১৪ ভাগ, মাখন ১৮ ভাগ আছে। ইহা পুরা সিদ্ধ করিয়া খাইলে হজম হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম দেড় ঘণ্টায় হজম হয়।

মাছ—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বেশী তৈলযুক্ত মাছ হজমের পক্ষে বিঘ্নকর ও উত্তেজনাজনক হয়। পচিবার উপক্রম হইলে সে মাছ পরিত্যজ্য।

ঘৃত, তৈল—এই দুটী দেহের অত্যন্ত আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী। কিন্তু ঘৃতে অনেক বীভৎস ও অপথ্য পদার্থের ভেজাল থাকে এবং তাহা মহার্ঘ। ঘৃতের অভাব খাঁটী তেলে পূরণ করা যায়। মান্দ্রাজ তিল তৈল এবং নারিকেল তৈল ঘিয়ের বদলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া চিনি বাদামের তেলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সব তেল অনিষ্টকর নহে এবং ঘিয়ের চেয়ে অল্প একটু নিকৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য।

তরিতরকারী—উহার মধ্যে আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মুখরোচক তরকারী। ইহাতে জল ৮০ ভাগ আর শ্বেতসার ২০ ভাগ। খোসা ছাড়াইয়া খাইলে ইহার সার ভাগ অনেকটা কমিয়া যায়। আলু সিদ্ধ হইবার পর তাহার খোসা তুলিয়া লইলে সারভাগ এত নষ্ট না। অধিকাংশ তরিতরকারীতেই জল-ভাগ খুব বেশী। কিন্তু তরকারী শরীর পোষণের জন্য প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে যে লাবণিক পদার্থ আছে, তাহা রক্ত পরিষ্কার করে। ফলেও সেই উপকার হয়। তরিতরকারী কোষ্ঠবদ্ধতার নিবারক। রাঙ্গা আলুতে চিনি জাতীয় পদার্থ ও শ্বেতসার থাকাতে বেশ উপকারী খাদ্য। কড়াইসুঁটি, বরবটি, সিম প্রভৃতি সুঁটিজাতীয় তরকারী ডালের মতই উপকারী। কাঁঠালের বীজে ছানা জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট আছে—এই হিসাবে ইহা গমের চেয়েও সারবান।

চিনাবাদাম—এখানে চিনাবাদামের চাষ হইতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহার চাষ আরও বেশী পরিমাণে করিলে ছেলেদের জলখাবারের জন্য ইহার ব্যবহার হইতে পারে। চিনাবাদাম অধিক খাইলে ইহার তৈল জাতীয় জিনিষটা অপকার করে। ইহাতে ছানা পদার্থ শতকরা ২৬ ভাগ ও তৈল পদার্থ ৪৩ ভাগ আছে।

উপসংহারে বক্তব্য—আহার্য্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। পরিপাক যন্ত্রের কাজ মুখ হইতে আরম্ভ হয়। দাঁতকে তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিতে দেওয়া চাই—খাবার অতি সূক্ষ্ম হইয়া উদরে যাওয়া প্রয়োজন এবং মুখের লালা উহার সহিত মিশ্রিত হওয়া দরকার। এই লালা খাদ্যের শ্বেতসারকে চিনিতে পরিণত করে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

অস্থি পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এস, এম, এস।

অস্থি ও অস্থির কার্য্য। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমে অস্থির বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। —কেননা অস্থি সমূহকে অবলম্বন করিয়াই শরীর অবস্থিত আছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "বৃক্ষ যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, দেহীদিগের দেহও সেইরূপ অস্থিসারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই জন্য দেহীদিগের ত্বক্, মাংস প্রভৃতি শীঘ্র বিনষ্ট হইলেও সার স্বরূপ অস্থি সকল সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।"*

অপিচ, অস্থি সকল মনুষ্যকে যথোচিত আকার বিশিষ্ট করে। অস্থি না থাকিলে মনুষ্যের আকার এরূপ হইত না, একটা কদাকার মাংসপিণ্ড হইয়া ভূমিতে গড়াইয়া বেড়াইত। শরীরাভ্যন্তরস্থ সুকোমল যন্ত্রগুলিও অস্থিময় আবরণে রক্ষিত হয়। যথা, মস্তকের অস্থি সকল শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ মস্তিষ্ককে এবং বক্ষঃস্থলের অস্থি সকল হৃদয়, ফুস্ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রকে রক্ষা করে। সুতরাং শরীরের প্রধান যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করা অস্থির অন্যতম কার্য্য। তদ্ভিন্ন অস্থি সংযুক্ত হইয়াই পেশী সমূহ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের নানা প্রকার গতি উৎপন্ন করে।

অস্থির উপাদান। অস্থি দুই প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত—পার্থিব ও জান্তব। পার্থিব উপাদানের প্রায় সমস্ত অংশই চূণ।

---

* "অভ্যন্তর গতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্।"
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়।

জান্তব উপাদানের অধিকাংশ শণের ন্যায় সূক্ষ্ম তন্তু বা স্নায়ু। স্নায়ু নির্ম্মিত কাটামোর মধ্যে পার্থিব উপাদান সংহত হইয়া অস্থি সমূহ গঠিত হয়।

উপাদানের দ্বিবিধ সংযোগ। অস্থির উপাদানের সংযোগ দুই প্রকার, যথা ঘনসংযোগ এবং সচ্ছিদ্র (ফোঁপরা) সংযোগ*। সমস্ত অস্থির বিশেষতঃ নলকাস্থির কাণ্ডের বহির্ভাগে ঘনসংযোগ দেখা যায়। ক্ষুদ্র অস্থি সমূহের ও কপালাস্থির অভ্যন্তর ভাগে এবং নলকাস্থির প্রান্তভাগে সচ্ছিদ্র সংযোগ দৃষ্ট হয়।

বয়স ভেদে উপাদানের তারতম্য। বয়স ভেদে অস্থির উপাদানের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। কম বয়সে অস্থিতে জান্তব উপাদান অধিক থাকে। জান্তব উপাদান কোমল এবং সহজে ভাঙ্গে না। এইজন্য বাল্যকালে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় না, নত হইয়া যায়। ভাঙ্গিলেও কাঁচা গাছের ডালের মত অংশতঃ ভাঙ্গে এবং সহজে জোড়া লাগে। বয়স যত অধিক হয়, অস্থির জান্তব উপাদান ততই কমিয়া যায় এবং পার্থিব উপাদান বাড়িতে থাকে। ক্রমে বৃদ্ধবয়সে পার্থিব উপাদান অত্যন্ত অধিক এবং জান্তব উপাদান অত্যন্ত কম হইয়া যায়। পার্থিব উপাদান কঠিন, কিন্তু ভঙ্গ প্রবণ। এইজন্য বৃদ্ধ বয়সে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভাঙ্গিলে শীঘ্র জোড়া লাগে না।

পরে যে তরুণাস্থির বিষয় কথিত হইবে, তাহাতে জান্তব উপাদানই অধিক থাকে। ভ্রূণশরীরে অস্থিসমূহ প্রথমে তরুণাস্থিরূপে উৎপন্ন হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত পার্থিব উপাদানের সঞ্চয়ে উহা ক্রমে কঠিন অস্থিতে পরিণত হয়।

অস্থির আবরণ। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে অস্থির আবরণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে আবরণ অস্থির বহির্ভাগ আবৃত করিয়া থাকে, তাহাকে **অস্থিধরা কলা**† বলা যায়। ইহা অস্থির জীবন স্বরূপ; কারণ, এই ঝিল্লী বা পর্দ্দা আহত হইলে সেই অস্থি বা অস্থির সেই অংশ নষ্ট হইয়া যায়। আর অস্থির যে আবরণ অস্থির ভিতরে মধ্যবর্ত্তী ছিদ্রপথকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে আভ্যন্তর আবরণ বলা যায়। অস্থির ছিদ্রমধ্যে মজ্জা থাকে বলিয়া উক্ত আবরণের নাম **মজ্জধরা কলা**।

অস্থির মধ্যে যে মজ্জা থাকে তাহা দুই প্রকার,—এক প্রকার রক্তবর্ণ, অন্য প্রকার পীতবর্ণ। দীর্ঘ অস্থিসমূহের নলকাংশের মধ্যে পীতবর্ণ মজ্জা থাকে। দীর্ঘ অস্থির উভয় প্রান্তে, ক্ষুদ্র অস্থির ভিতরে এবং অন্যান্য অস্থির স্পঞ্জের ন্যায় বহুচ্ছিদ্র বিশিষ্ট অংশে রক্তবর্ণ মজ্জা থাকে।

অস্থির প্রকার ভেদ। শরীরের যেখানে যেরূপ আবশ্যক, অস্থি সকল সেইস্থানে সেইরূপ আকারে অবস্থিত। সুশ্রুত মতে—আকার ভেদে অস্থি সকল পাঁচ ভাগে

---

* ঘন সংযোগ—Compact tissue—(কমপ্যাক্ট টিস্থ)। সচ্ছিদ্র সংযোগ—Cancellous tissus—(ক্যানসেলাস্ টিস্থ)।

† অস্থিধরা কলা—Periosteum—(পেরিয়স্টিয়ম্)।

বিভক্ত ; যথা—কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় এবং নলক। কপালের (খাপরার) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া মস্তকের অস্থিগুলিকে **কপালাস্থি** বলে। রুচক অর্থাৎ চিরুণীর দাঁতের ন্যায় বলিয়া দন্তগুলিকে **রুচকাস্থি** বলে। অস্থির তরুণ অবস্থার ন্যায় (ভ্রূণশরীরে যেরূপ থাকে সেইরূপ) আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি স্থানের কোমল অস্থিকে **তরুণাস্থি** বলে। বলয় অর্থাৎ প্রায় বালার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের অস্থিকে **বলয়াস্থি** বলে। নলের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি বলিয়া বাহু, সক্থি ও অঙ্গুলির অস্থিগুলিকে **নলকাস্থি** বলে।

এই সকল অস্থি ব্যতীত এরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র অস্থি আছে যে গুলিকে এই পাঁচ প্রকার অস্থির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইহাদিগকে **বিষমাস্থি** বলিতে পারা যায়*। হস্ত, পদাদির সন্ধিস্থলে এইরূপ কয়েকটী অস্থি আছে।

অস্থির সংখ্যা—চরক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বেদবাদীদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিনশত ষাট। সুশ্রুত, ভেল প্রভৃতি শল্যতান্ত্রিকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিন শত। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা দুই শত বা দুই শত ছয়।

অস্থিসংখ্যা সম্বন্ধে পরস্পরের মত এইরূপ ভিন্ন বা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকল মতই সমীচীন; কেন না এইরূপ মতভেদ দুইটী কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম কারণ—গণনার প্রকার ভেদ। তরুণ অস্থি, নখ ও দন্ত সমূহকে চরকাদির মতে অস্থি বলিয়া গণনা করা হয়। সুশ্রুতাদি শল্যতান্ত্রিকগণ তরুণ অস্থি এবং দন্ত সকলকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু নখের গণনা করেন না। পাশ্চাত্যগণ তরুণাস্থি, নখ ও দন্ত সমূহকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন না।

দ্বিতীয় কারণ—পৃথক্ বয়সে অস্থি গণনা। এই জন্যও অনেকটা মতভেদ ঘটে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ যৌবনের আরম্ভে অস্থির গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্যগণ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক অথবা প্রৌঢ় ব্যক্তির শরীরের অস্থি গণনা করিয়া থাকেন। বাল্যকালে বা যৌবনের আরম্ভে কতকগুলি অস্থির অবয়ব পৃথক্ থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সেইগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া এক একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। এই জন্যও সংখ্যার পার্থক্য ঘটে।

আমরা প্রৌঢ় শরীরে প্রত্যক্ষদৃষ্ট অস্থির সংখ্যা ধরিয়া অস্থির বর্ণনা করিব। তরুণাস্থি, দন্ত ও নখের সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হইবে না, কারণ তরুণাস্থি সমূহের সংখ্যা কণ্ঠনালী (শ্বাসপথ) প্রভৃতি অনেক স্থানে অনিশ্চিত এবং উৎপত্তিক্রম ধরিয়া বিচার করিলে নখ ও দন্ত সকল ত্বকেরই কঠিন পরিণতি মাত্র।

অস্থি গণনা।

শাখাস্থি—প্রত্যেক পদের এক এক অঙ্গুলিতে তিন তিন খানি এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে

* নলকাস্থি—Long bones (লং বোন্‌স্)। কপালাস্থি—Flat bones (ফ্লাট বোন্‌স্)। তরুণাস্থি—Cartilage (কার্টিলেজ)। বিষমাস্থি—Irregular bones—(ইরেগুলার বোন্‌স্)।

দুইখানি—এইরূপে পদাঙ্গুলি সমূহে মোট চৌদ্দখানি এবং পাঁচটী পদাঙ্গুলির মূলে পাঁচখানি অস্থি আছে। পদের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ জঙ্ঘা ও পদের সন্ধির নিম্নে সাতখানি ছোট ছোট অস্থি আছে। জঙ্ঘায় দুই খানি, উরুতে একখানি এবং উরু ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে জানুতে একখানি অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক সক্‌থিতে ত্রিশখানি করিয়া দুই সক্‌থিতে মোট ষাটখানি অস্থি আছে।

পদাঙ্গুলির ন্যায় হস্তের অঙ্গুলি সমূহে চৌদ্দ খানি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির মূলে একখানি করিয়া পাঁচখানি শলাকা-অস্থি আছে। উহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ মণিবন্ধসন্ধির নিম্নে ক্ষুদ্রাকার আট খানি, এবং প্রকোষ্ঠে (নীচে হাতে) দুইখানি ও প্রগণ্ডে (উপর হাতে) একখানি দীর্ঘাকার অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক বাহুতে ত্রিশ খানি করিয়া দুই বাহুতেও মোট ষাট খানি অস্থি আছে।

মধ্যশরীরের অস্থি—কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) চব্বিশ খানি অস্থি আছে এবং তাহার নিম্নে অর্থাৎ কটীর পশ্চাদ্‌ভাগে একখানি বৃহত্তর অস্থি আছে। এই বৃহত্তর অস্থির নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে; সুতরাং পৃষ্ঠবংশের অস্থির সংখ্যা মোট ছাব্বিশ খানি।

কটীর সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ—দুই দিক জুড়িয়া দুই খানি, বৃহৎ কপালাস্থি আছে।

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে একখানি, কণ্ঠের দুই দিকে দুই খানি, স্কন্ধের পশ্চাদ্ ভাগে পৃষ্ঠের উপর দুই দিকে দুই খানি এবং পার্শ্বদেশে (পাঁজরায়) প্রত্যেক দিকে বার খানি করিয়া দুই দিকে চব্বিশ খানি অস্থি আছে। এইরূপে মধ্য শরীরে আটান্ন খানি অস্থি গণনা করা যায়।

মস্তকের অস্থি—নীচের চোয়ালে একখানি, উপরের চোয়ালে দুইখানি, দুইগণ্ডে দুইখানি, তালুতে দুইখানি, দুই নাসিকায় দুইখানি, নাসিকাদ্বয়ের মধ্যস্থলে একখানি, দুই নাসিকার ভিতরে দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই চক্ষুর দুই পার্শ্বে দুইখানি—এইরূপে চৌদ্দখানি অস্থি মস্তকের নিম্নভাগ বা মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করে। মস্তকের উপরিভাগে সম্মুখে একখানি, পশ্চাতে একখানি, দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই শঙ্খদেশে (রগে) দুইখানি-এইরূপ ৪ খানি কপালাস্থি এবং নাসিকাদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে একখানি এবং এই সব অস্থিগুলির মধ্যস্থলে গলার ছাদ জুড়িয়া একখানি অস্থি আছে। এইরূপে মস্তকের অস্থির সংখ্যা বাইশখানি।

এতদ্ভিন্ন কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে প্রত্যেক কর্ণে তিনখানি করিয়া দুই কর্ণে ছয়খানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে। এই ছয়খানি অস্থি গণনা করিলে মস্তকের অস্থির সংখ্যা আটাশখানি হয়। সুতরাং এই হিসাবে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত ছয়খানি। কর্ণমধ্যস্থ ছয়খানি অস্থি গণনা না করিলে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অনেকের হস্তপদাদির কণ্ডরার শেষভাগে ছোলার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি দেখা যায়। কিন্তু এই সকল অস্থির অস্তিত্ব অনিশ্চিত বলিয়া উহাদের সংখ্যা গণনা করা হয় না।

তরুণাস্থি—(Cartilage—কার্টি-

লেজ)—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে তরুণ অস্থির সংখ্যা অস্থিগণনার মধ্যে ধরা হইবে না। দিগ্‌দর্শনের জন্য সংক্ষেপে তরুণ অস্থির বিষয় কথিত হইতেছে। হস্ত দ্বারা কর্ণপালি বা নাসিকার অগ্রভাগ টিপিলে ভিতরে যে একটা নাতিকঠিন পদার্থ অনুভব করা যায়, উহাই তরুণাস্থি। পৃষ্ঠবংশের অস্থিগুলির সংযোগ স্থলে, সচল সন্ধি সমূহের ভিতরে, পশুর্কাগুলির সম্মুখ ভাগে, নাসিকার দুই-পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে, কর্ণপালীতে, শ্বাসনলীতে এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহে তরুণাস্থি দেখা যায়। চলিত কথায় তরুণাস্থিকে কুচ্‌-কুচে হাড় বলে। তরুণাস্থিতে স্নায়ুভাগ অধিক এবং চুণের ভাগ অল্প থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে অনেক তরুণাস্থি চুণের ভাগ অধিক হওয়ায় কঠিন হইয়া যায়।

অস্থিপোষণ—প্রত্যেক অস্থির বহির্ভাগে একটী বা একাধিক ছিদ্র দেখা যায়। ধমনী সকল ঐ ছিদ্রের মধ্যে দিয়া অস্থির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বহু সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া অস্থির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রদেশে বিস্তৃত হয়। এই সকল ধমনী দ্বারা বিশুদ্ধ রক্ত আসিয়া সমগ্র অস্থির পোষণ করে। সিরা সকলও সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত থাকিয়া অস্থির ভিতরে বিস্তৃত থাকে, ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলতর সিরারূপে অস্থির ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। এই সকল সিরা দ্বারা অবিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়। ধমনীর রক্ত কোথা হইতে আসে এবং সিরার রক্ত কোথায় যায়—তাহা পরে বলা যাইবে।

অস্থি বর্ণনা।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির আকৃতি, সন্ধি, কার্য্য এবং পেশীর সহিত সংযোগ প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। অথচ এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনা সাধারণ পাঠক এবং কায়চিকিৎসক-দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে না। এইজন্য আমরা এস্থলে সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন অস্থির বিষয় বর্ণনা করিব। প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়া প্রথমে পায়ের দিক হইতেই অস্থির বর্ণনা করা যাইতেছে।

বর্ণনা বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক।

একটি নরকঙ্কাল দুইটি হাত চিৎ করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া আছে—ধরিয়া লইতে হইবে। উক্ত কঙ্কালের নাসিকাগ্র হইতে নাভির অনুক্রমে নীচে উপরে বিস্তৃত একটী সরল রেখা টানিলে, সেই রেখা মধ্যরেখা নামে অভিহিত হয়। শরীরের যে অংশ এই মধ্যরেখার সমীপবর্ত্তী তাহা অন্তঃসীমা এবং যে অংশ দূরবর্ত্তী তাহা বহিঃসীমা বলিয়া কথিত হইবে। ঊর্দ্ধভাগ বলিলে পদ হইতে মস্তকের দিকে এবং অধোভাগ বলিলে মস্তক হইতে পদের দিকে বুঝিতে হইবে। সম্মুখ-ভাগ বলিলে বর্ণিত নরকঙ্কালের সম্মুখ ভাগ (যেমন করের সম্মুখ ভাগ বলিলে রেখাঙ্কিত ভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগ বলিলে তাহার বিপরীত ভাগ বুঝাইবে।

শাখাস্থি।

পাদাঙ্গুলির অস্থি।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিন-খানি করিয়া এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে দুইখানি করিয়া অস্থি আছে। এই সকল অস্থিকে **অঙ্গুলি-নলক*** বলা যায়। অঙ্গুলিনলক সকল

* ইং—Phalanges—ফ্যালাঞ্জেস্‌।

স্থানভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—অগ্রিম, মধ্যম এবং পশ্চিম শ্রেণী। অগ্রিম শ্রেণী অর্থাৎ সম্মুখভাগে নখসংযুক্ত যে সকল অস্থি আছে উহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং উহাদের অগ্রভাগ নখধারণের জন্য আয়ত। ইহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে মধ্যম শ্রেণীর অস্থি না থাকায় উহার অগ্রিম অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বন্ধ। মধ্যম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির সম্মুখভাগ অগ্রিম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বন্ধ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বন্ধ। এইরূপ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির সম্মুখভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগ মূলশলাকাগুলির সহিত সম্বন্ধ।

পাদাঙ্গুলিনলকের পশ্চাতে পাঁচ খানি **মূলশলাকা*** নামক নলকাস্থি আছে। ইহারা যথাক্রমে পাদাঙ্গুষ্ঠমূলশলাকা, তর্জ্জনী-মূলশলাকা, মধ্যমামূলশলাকা, অনামিকামূল-শলাকা ও কনিষ্ঠামূলশলাকা নামে অভিহিত। তন্মধ্যে তর্জ্জনীমূলশলাকা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকা সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও হ্রস্ব। ইহাদের সম্মুখভাগ পশ্চিম অঙ্গুলি নলকের সহিত সংহিত। মূলশলাকাগুলির পশ্চাতে সাতখানি বিষমাকার **কূর্চ্চাস্থি†** আছে। সেই অস্থিগুলি পদের পশ্চাদ্‌ভাগ নির্ম্মাণ করে এবং কূর্চ্চাস্থি নামে অভিহিত। সাতখানি কূর্চ্চাস্থির নাম যথা, **কূর্চ্চশির, পার্ষ্ণি, নৌনিভ, ঘন, বহিঃ**

* ইং—Metatarsals—মেটাটারস্তাল্‌স্।

† ইং—Tarsals—টার্সাল্‌স্।

[দ্বিতীয় চিত্র]।

পাদাস্থি।

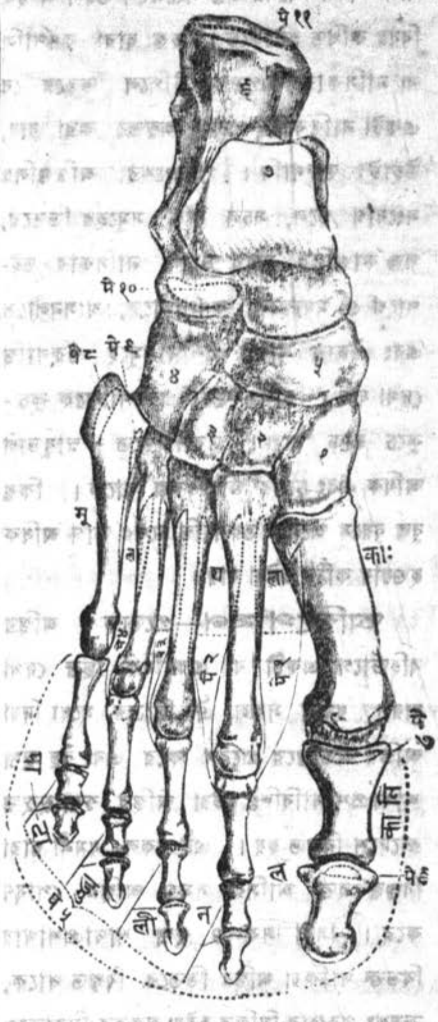

নিম্নে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার রেখার মধ্যে অঙ্গুলি নলক, তদুপরি মূলশলাকা, এবং তদুপরি সাতখানি কূর্চ্চাস্থি দ্রষ্টব্য। কূর্চ্চাস্থি যথা ;—

(১) ১—অন্তঃকোণক। (২) ২—মধ্য কোণক। (৩) ৩—বহিঃ কোণক। (৪) —৪ ঘন। (৫) ৫—নৌনিভ। (৬) ৬—পার্ষ্ণি। (৭) ৭—কূর্চ্চ শির।

"পি" (পে) চিহ্নিত স্থান পেশীর নিবেশ স্থল বুঝিতে হইবে।

কোণক, মধ্যকোণক ও অন্তঃকোণক। ইহাদের মধ্যে শেষের চারিখানি অস্থির সম্মুখভাগের সহিত মূল-শলাকাগুলির পশ্চাদ্‌ভাগ সংহিত হইয়া থাকে।

কূর্চ্চশির—নামক অস্থি সমস্ত কূর্চ্চাস্থির শীর্ষদেশে অবস্থিত। ইহার গোলাকার মুণ্ড ও পার্শ্বদ্বয় জঙ্ঘার অস্থিদ্বয়ের অধোভাগের সহিত এবং নিম্নভাগ সম্মুখদিকে নৌনিভ নামক অস্থির সহিত ও পশ্চাদ্‌ভাগে পার্ষ্ণি নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

পার্ষ্ণি—নামক অস্থি কূর্চ্চাস্থি সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই অস্থি দ্বারা পার্ষ্ণি বা গোড়ালি নির্ম্মিত হয় এবং ইহার উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে। পার্ষ্ণির ঊর্দ্ধভাগ কূর্চ্চশির নামক অস্থির সহিত এবং সম্মুখভাগ ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

নৌনিভ—নামক অস্থি অনেকটা নৌকার ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার সম্মুখভাগ কোণক নামক তিনখানি কূর্চ্চাস্থির সহিত, পশ্চাদ্‌ভাগ কূর্চ্চশির নামক অস্থির সম্মুখের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

ঘন—নামক কূর্চ্চাস্থি পদের বহিঃসীমায় অবস্থিত। এই অস্থির সম্মুখভাগ কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

অন্তঃকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি ত্রিকোণ প্রায় এবং ইহার সম্মুখভাগ অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

মধ্যকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণাকার এবং ক্ষুদ্রতম। ইহার সম্মুখভাগ তর্জ্জনীমূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

বহিঃকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণ। ইহার সম্মুখভাগ মধ্যমামূল-শলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

অন্তঃকোণক, মধ্যকোণক এবং বহিঃ-কোণক এই তিন খানি অস্থি কোণত্রয় নামে অভিহিত। কূর্চ্চাস্থিগুলি সম্মুখে, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে পরস্পর দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। বাহুল্য ভয়ে উহাদের সন্ধির বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইল না। দ্বিতীয় চিত্র দেখিলে উহাদের সংস্থান বোধগম্য হইবে।

জঙ্ঘাস্থি (তৃতীয় চিত্র)* —জঙ্ঘার দুইখানি অস্থির মধ্যে স্থূলতর অস্থিখানিকে জঙ্ঘাস্থি বলে। ইহা ঊরুর অস্থি ব্যতীত শরীরের অন্যান্য নলকাস্থি অপেক্ষা দীর্ঘ ও স্থূল। দুই প্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে সকল নলকাস্থির ন্যায় ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্ত উপরিভাগে ঊর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তস্থ কন্দদ্বয়ের সহিত এবং সম্মুখে জান্বস্থির সহিত সংহিত হয়। ইহারই পশ্চাদ্‌ভাগে বহির্দ্দিকে অনুজঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধ-প্রান্ত সংলগ্ন হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধ প্রান্তের দুইদিকে দুইটী উৎসেধ এবং উহাদের মধ্য-স্থলে একটী দ্বিমুখ কণ্টক আছে।

জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্ত—ঊর্দ্ধ প্রান্ত অপেক্ষা ছোট। ইহার পার্শ্বভাগের ত্রিকোণাকার অংশের সহিত অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্ত এবং নিম্নভাগের খাঁজের সহিত কূর্চ্চশির অস্থি সংহিত থাকে। অধঃপ্রান্তের ভিতরদিকে যে উন্নত প্রদেশ আছে তাহাকে অন্তর্গুল্ফ বা ভিতরদিকে গাঁট বলে। উহার সহিত

* ইং—Tibia—টিবিয়া।

[তৃতীয় চিত্র]

জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি।

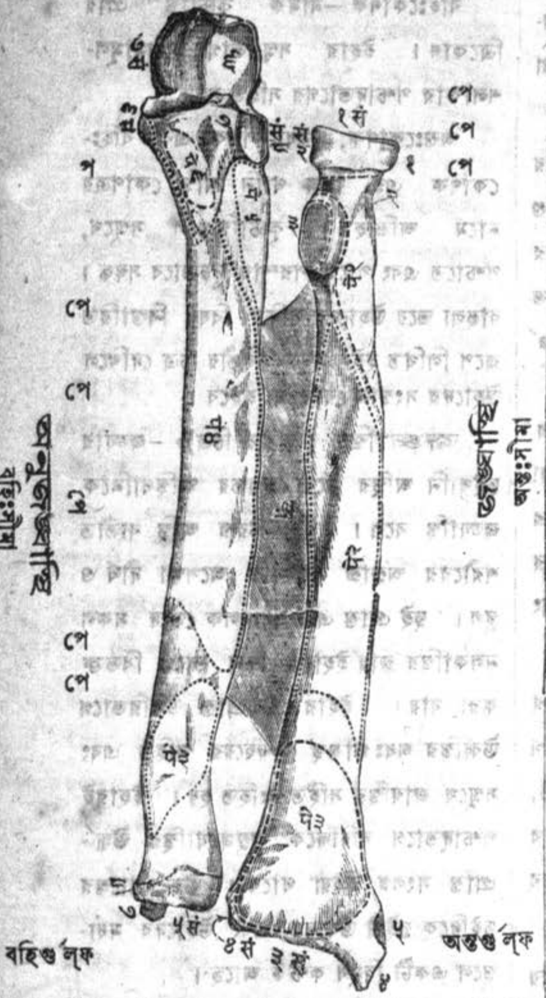

(১-২) ২—দুইটী উৎসেধ। (সং, সং) সং, সং—ঊর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তের সহিত সন্ধির স্থান। (ক) ক—সন্ধিচিহ্ন মধ্যস্থ দ্বিমুখ কন্টক। (৩) ৩—জানু-কপাল বন্ধনী পেশীর সংযোগস্থল। (৪) ৪—অনু-জঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের সহিত সন্ধিস্থল। (৫) ৫—জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তের সন্ধির স্থান। (৬) ৬—কূর্চ্চশির অস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৭) ৭—কূর্চ্চ-শিরের বহিঃসীমার সহিত সন্ধির স্থান।

অনুজঙ্ঘাস্থি—(৪) ৪—জঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের সহিত সন্ধির স্থান। (৮) ৮—সন্ধিবন্ধনী স্নায়ুর সংযোগস্থল।

(ঘ) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর সংযোগস্থল।

কূর্চ্চশির নামক অস্থির বহিঃসীমা সংযুক্ত হয়। জঙ্ঘাস্থির মধ্যনলক বা কাণ্ড ঈষৎ বক্রাকার। ইহার সহিত কোন অস্থির সন্ধি নাই, কিন্তু ইহাতে অনেক পেশী ও জঙ্ঘাস্তরালা কলা সম্বদ্ধ থাকে। পেশীর বিষয় পরে বিস্তারিত ভাবে বলা যাইবে।

অনুজঙ্ঘাস্থি (তৃতীয় চিত্র)*—ইহা দেখিতে দীর্ঘ যষ্টির মত এবং জঙ্ঘাস্থির ন্যায় ঊর্দ্ধ প্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক—এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্ত জঙ্ঘাস্থিমুণ্ডের পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত এবং অধঃপ্রান্তের ভিতর দিক জঙ্ঘাস্থির অধঃ-প্রান্তের পার্শ্ব ভাগের সহিত ও কূর্চ্চশির নামক অস্থির সহিত সংহিত। এই প্রান্ত উৎ-সেধ বিশিষ্ট এবং সেই উৎসেধ বহির্গুল্ফ (গাঁট) নামে অভিহিত। ইহার মধ্যনলকের সহিত আটটী পেশী সংযুক্ত থাকে।

[চতুর্থ চিত্র]

জান্বস্থি।

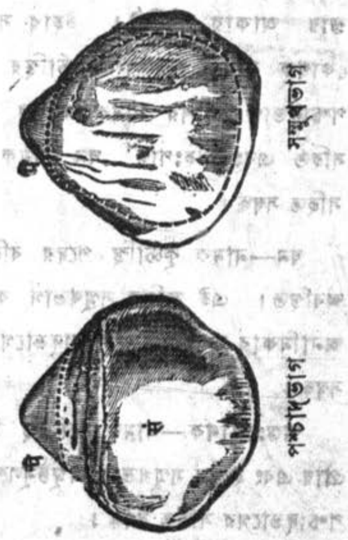

* ইং—Fibula—ফিবুলা।

(স্বং) সং—সন্ধিচিহ্ন। এই চিহ্নের উর্দ্ধভাগ উর্ব্বস্থির নিম্ন প্রান্তের সম্মুখভাগের সহিত সংহিত হয়। (পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সংযোগ স্থল।

জান্বস্থি* (মালুইচাকি)—ইহা প্রায় গোলাকার কপালাস্থি। ইহার পশ্চাদ্ভাগের উর্দ্ধাংশ উরুর অস্থির সহিত এবং নিম্নাংশ জঙ্ঘার সহিত সংহিত হয়। (চতুর্থ চিত্র)

উর্ব্বস্থি†—(পঞ্চম চিত্র) ইহা সমস্ত নলকাস্থি অপেক্ষা বৃহৎ, দৃঢ়, বহুভারসহ, এবং মধ্যস্থলে বাঁশের ন্যায় গোলাকার ও ঈষৎ বক্র। ইহাও উর্দ্ধ প্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক এই তিন ভাগে বিভক্ত।

ইহার উর্দ্ধপ্রান্তে গোলাকার মুণ্ড, মুণ্ডের নিম্নে গ্রীবা এবং তন্নিম্নে একদিকে মহাশিখরক ও অন্যদিকে লঘুশিখরক নামক দুইটী উৎসেধ আছে। তন্মধ্যে মুণ্ড শ্রোণিফলক নামক অস্থির গভীর কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহার সহিত সন্ধিযুক্ত হয়। ইহার গ্রীবা সাধারণতঃ তির্য্যকৃভাবে অবস্থিত, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মধ্যনলকের সহিত প্রায় সমকোণ হইয়া যায় এবং ভঙ্গপ্রবণ হয়। মহাশিখরক এবং লঘুশিখরক নামক অংশদ্বয়ের সহিত বহুপেশী সংযুক্ত থাকে।

উর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তে যে দুইটি কন্দ বা মহার্ব্বুদ আছে, উহারা জঙ্ঘাস্থির সহিত এবং উভয় কন্দের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার সম্মুখের অংশ জান্বস্থির সহিত সংহিত হয়।

এক সক্থির ত্রিশখানি অস্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইল। অপর সক্থিতেও অস্থির এইরূপ সন্নিবেশ আছে।

[পঞ্চম চিত্র]

উর্ব্বস্থি।

উর্দ্ধ প্রান্ত।

অধঃপ্রান্ত

(১) ১—মুণ্ড। (২) ২—গ্রীবা। (৩) ৩—মহাশিখরক। (৪) ৪—লঘুশিখরক। (৫) ৫—মহাশিখরাগ্রস্থিত কোটর। (৬, ৭) ৬, ৭—দুইটি কন্দ বা মহার্ব্বুদ।

(স্বং) সং—জানু কপালের সহিত সন্ধিস্থান। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর নিবেশ স্থল।

* ইং—Patella—প্যাটেলা।

† ইং—Femur—ফিমর্।

[ষষ্ঠ চিত্র]

করাস্থি।

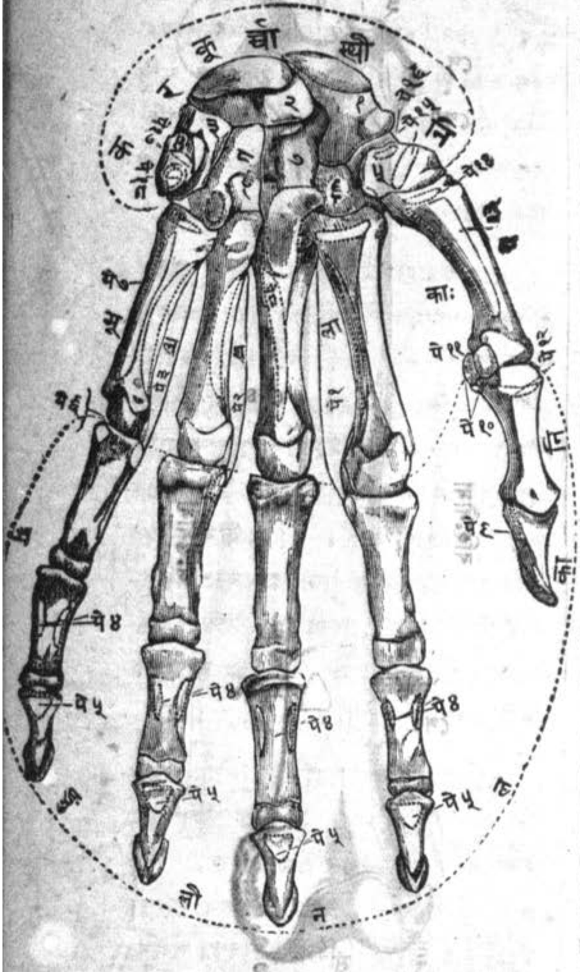

নিম্নে অঙ্গুলিনলক, তদুপরি মূলশলাকা এবং তদুপরি কূর্চ্চাস্থি। সাতখানি কূর্চ্চাস্থি যথা,—(১) ১—নৌনিভিক। (২) ২—অর্দ্ধচন্দ্র। (২) ৩—উপলক। (৪) ৪—বর্ত্তুলক। (৫) ৫—পর্য্যাণক। (৬) ৬—কূটক। (৭) ৭—মধ্যকুট। (৮) ৮—ফণধর। (পে) পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীসংযোগস্থল।

করাস্থি—পাদাঙ্গুলির ন্যায় করাঙ্গুলিতেও চৌদ্দখানি অস্থি এবং তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে পাঁচখানি মূলশলাকা আছে। উহাদের সন্নিবেশও পাদাঙ্গুলির ন্যায়, কেবল সংজ্ঞার কিঞ্চিৎ পার্থক্য এই যে, ইহাদিগকে **করাঙ্গুলিনলক** ও **করাঙ্গুলি-মূলশলাকা** বলে। (ষষ্ঠ চিত্র)

মণিবন্ধপ্রদেশে আটখানি ক্ষুদ্র বিষমাস্থি আছে, ইহাদিগকে **করকূর্চ্চাস্থি*** বলে। ইহারা অগ্রিম ও পশ্চিম (বা অধঃ ও উর্দ্ধ) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্রিম শ্রেণীর চারিখানি অস্থি যথাক্রমে **পর্য্যাণক, কূটক, মধ্যকুট ও ফণধর** নামে এবং পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি **নৌনিভক, অর্দ্ধচন্দ্র, উপলক ও বর্ত্তুলক** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির মধ্যে তিনখানি অস্থি মণিবন্ধ সন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট। বর্ত্তুলক নামক কূর্চ্চাস্থি মণিবন্ধসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না। এই অস্থিকে কেহ কেহ কণ্ডরামধ্যস্থ চণকাস্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেজন্য তাঁহাদের হিসাবে পদের ন্যায় করেও সাত খানি মাত্র কূর্চ্চাস্থি আছে।

পর্য্যাণক—ইহার সম্মুখভাগ অঙ্গুষ্ঠমূল-শলাকার সহিত এবং অন্তঃপার্শ্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগ নৌনিভক, কূটক ও তর্জ্জনী-মূলশলাকার সহিত সম্বদ্ধ।

কূটক—কূট (নেহাই) সদৃশ আকার বিশিষ্ট এই অস্থিটী অধঃসীমায় তর্জ্জনীমূল-

* ইং—Carpals—কার্প্যালস্।

শলাকার সহিত, উর্দ্ধসীমায় নৌনিভক অস্থির সহিত, বহিঃসীমায় পর্য্যাণক অস্থির সহিত এবং অন্তঃসীমায় মধ্যকূট অস্থির সহিত সংহিত।

মধ্যকূট—ইহা করের কূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ইহার উর্দ্ধস্থ মুণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র অস্থির সহিত, অধোভাগ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার মূলশলাকার সহিত, বহিঃপার্শ্ব নৌনিভক ও কূটক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্শ্ব ফণধর নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

ফণধর—এই সর্পফণাকার প্রবর্দ্ধনযুক্ত অস্থিটী অধোভাগে কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকাদ্বয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্শ্বে উপলক ও অন্যপার্শ্বে মধ্যকূট নামক অস্থির সহিত সংহিত।

নৌনিভক—ইহার আকার নৌকার ন্যায়, কিন্তু নৌনিভ নামক পাদকূর্চ্চাস্থি অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার পশ্চাদ্ভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত, একপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র ও মধ্যকূটনামক অস্থিদ্বয়ের সহিত, এবং অধঃ বা সম্মুখভাগ পর্য্যাণক ও কূটক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত সংহিত।

অর্দ্ধচন্দ্র—ইহার বহির্ভাগ নৌনিভকাস্থির সহিত, উর্দ্ধভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত এবং সম্মুখভাগ উপলক, ফণধর ও মধ্যকূট নামক অস্থি তিনখানির সহিত সম্বদ্ধ।

উপলক—ইহার উর্দ্ধসীমাস্থ সন্ধিচিহ্ন মণিবন্ধসন্ধির মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত। ইহা অপর তিনদিকে ফণধর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বর্ত্তুলক নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

বর্ত্তুলক—ইহা বর্ত্তুলাকার ও ক্ষুদ্রতম কূর্চ্চাস্থি। ইহার পশ্চাদ্ভাগ এবং অন্তঃপার্শ্ব উপলকের সহিত সংহিত।

কর ও পদের কূর্চ্চাস্থি সকলের সম্মুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করা হইল তাহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। ঐ সকল অস্থি বিষমাকার বলিয়া উহাদের আকার ও সন্নিবেশ যথাযথরূপে বুঝিতে হইলে স্বহস্তে অস্থি লইয়া বারংবার পরীক্ষা করা আবশ্যক।

প্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাহুর নিম্নার্দ্ধ (কর বাদে) প্রকোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই প্রকোষ্ঠে দুইখানি নলকাস্থি আছে। তন্মধ্যে যেখানি বহিঃসীমায় থাকে, সেখানিকে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি এবং যেখানি অন্তঃসীমায় থাকে সেখানিকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে। বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্ত স্থূল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ মণিবন্ধসন্ধি নির্ম্মিত হয়। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধপ্রান্ত স্থূল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ কূর্পরসন্ধি নির্ম্মিত হয়।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র]* ইহা নলকাস্থি, অতএব উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত ও মধ্যনলক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। উর্দ্ধপ্রান্ত চক্রাকার এবং প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃসীমায় সংযুক্ত। উক্ত চক্রাকার অংশের ভিতরের দিকের অর্দ্ধচন্দ্রাকার সন্ধিচিহ্ন প্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধ প্রান্তে বহিঃপার্শ্বের সহিত সংলগ্ন হয়।

* ইং—Radius—রেডিয়স্।

[সপ্তম চিত্র] প্রকোষ্ঠাস্থি দ্বয়।

ঊর্দ্ধপ্রান্ত।

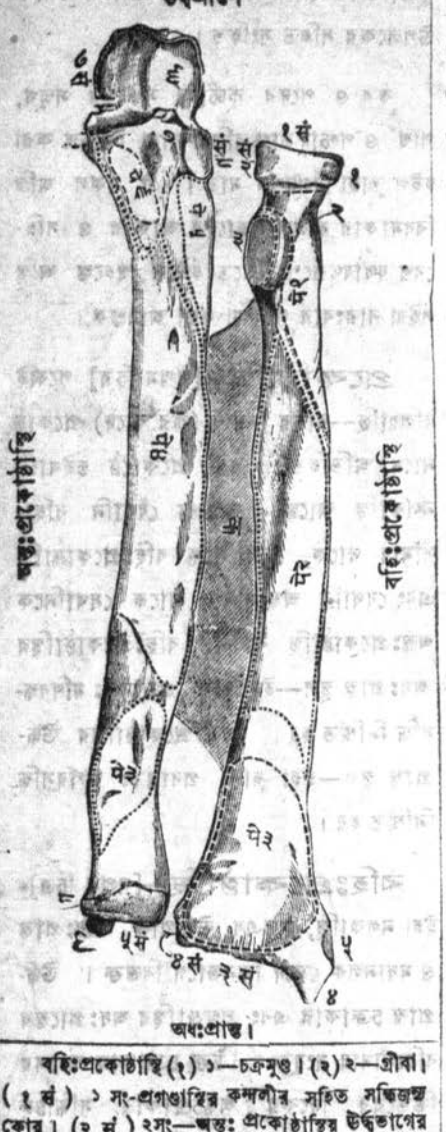

অধঃপ্রান্ত।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (১) ১—চক্রমুণ্ড। (২) ২—গ্রীবা। (১ সং) ১ সং-প্রগণ্ডাস্থির কন্দলীর সহিত সন্ধিজস্থ কোর। (২ সং) ২সং—অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (৩) ৩—পেশী নিবেশের জন্ম উৎসেধ। (৪) ৪—বহি মণিকা। (৪ সং) অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থির অধোভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (৩ সং) ৩ সং—মণিবন্ধসন্ধির স্থান। (৫) ৫—কণ্ডরা বিবর্ত্তন জন্ম খাঁজ। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (৬) ৭—চঞ্চু প্রবর্দ্ধনক। (৮) ৮—মণিমুণ্ড। (৯) ৯—অন্তম ণিক (৫ সং) ৫ সং—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৮ সং) ৮সং—চক্রনেমিখাতস্থিত সন্ধি চিহ্ন। (৭ সং) ৭ সং—প্রগণ্ডাস্থির ডমরু প্রবর্দ্ধনের সহিত সন্ধির স্থান।

(পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর নিবেশ স্থান।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নভাগ ত্রিকোণাকার এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও নৌনিভক নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত। এই ত্রিকোণাকার অংশের অন্তঃসীমা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নভাগের বহিঃপার্শ্বে সংলগ্ন থাকে। মধ্যনলকে অনেক পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। উহা ঈষদ্ বক্র এবং ত্রিধার বিশিষ্ট। ইহার ভিতরের দিকের ধারার সহিত "প্রকোষ্ঠান্তরালা" কলা সংযুক্ত থাকে।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি— [সপ্তম চিত্র] * এই নলকাস্থি ঊর্দ্ধপ্রান্ত, অন্তঃপ্রান্ত ও মধ্য-নকল ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্ত উপরে প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চক্রাকার ঊর্দ্ধপ্রান্তের অন্তঃপার্শ্বে সংহিত হয়। এই প্রান্তের পশ্চাদ্ভাগে যে উৎসেধ আছে, তাহাকে কূর্পর (কনুই) বলে। বাল্যকালে ইহা জানুকপালের ন্যায় পৃথক ভাবেই থাকে, কিন্তু যৌবনে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের সহিত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া যায়। প্রাচীন শারীরতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কূর্পরকপাল নামক পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ঊর্দ্ধপ্রান্তের সম্মুখস্থ প্রবর্দ্ধনক চঞ্চুপ্রবর্দ্ধন নামে খ্যাত।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নপ্রান্ত প্রায় গোলাকার এবং ইহার বহিঃপার্শ্ব বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নপ্রান্তের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহার নিম্নভাগে মণিবন্ধসন্ধির মধ্যস্থ ত্রিকোণাকার তরুণাস্থি সংযুক্ত থাকে। মধ্যনলকে

---

* ইং—Ulana—আলূন।

† ইং—Humerus—হিউমারাস্।

অনেক গুলি পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। ইহাও ত্রিধার বিশিষ্ট এবং ইহার বহির্ধারায় "প্রকোষ্ঠাস্ত-রালা" কলা সংলগ্ন থাকে।

প্রগণ্ডাস্থি—[অষ্টম চিত্র] + বাহুর মধ্যে ইহাই স্থূলতম নলকাস্থি। উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধপ্রান্তের অর্দ্ধ গোলাকার অংশ অংসফলকাস্থির অংসপীঠ নামক অংশের সহিত সংহিত হইয়া অংসসন্ধির সৃষ্টি করে। ইহার অধঃপ্রান্তের সহিত প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের উর্দ্ধপ্রান্ত দুইটির সন্ধি হইয়া কূর্পরসন্ধি নিষ্পন্ন হয়। এই অধঃ-প্রান্তের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে এক একটী খাত আছে। বাহু প্রসারিত করিলে পশ্চা-তের খাতে কূর্পর বা কনুই প্রবিষ্ট হইয়া যায়। বাহু সঙ্কুচিত করিলে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধ-প্রান্তের অগ্রভাগ (চঞ্চুপ্রবর্দ্ধনক) সম্মুখের খাতে প্রবিষ্ট হয়। প্রগণ্ডাস্থির মধ্যনলকে বহু পেশার সংযোগ আছে।

[অষ্টম চিত্র]

প্রগণ্ডাস্থি।

উর্দ্ধপ্রান্ত।

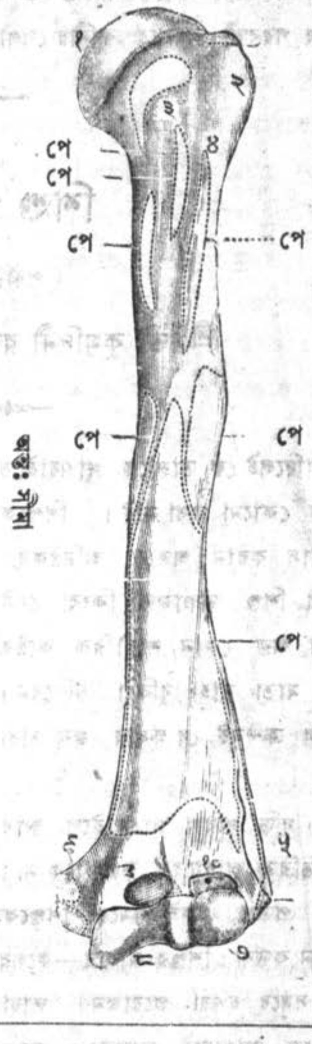

(১) ১—মুণ্ড। (২) ২—মহাপিণ্ডক। (৩) ৩—লঘুপিণ্ডক। (৪) ৪—পিণ্ডদ্বয় মধ্যগত পরিখা। (৫) ৫—বাহ্যার্ব্বুদ। (৯ ১০)—৯ ১০—দুইটী হাত।

এক বাহুর ত্রিশ থানি অস্থির বর্ণনা করা হইল। অপর বাহুতেও অস্থির সন্নিবেশ এইরূপ। অস্থির আকৃতি সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা প্রত্যক্ষ দর্শন সাপেক্ষ। তথাপি এইরূপ স্থূল বর্ণনা দ্বারা বাহু ও সক্‌থির অস্থি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান জন্মিলে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনীয় পেশী সমূহের ক্রিয়া কতকটা বুঝা যাইলে চিকিৎসার অনেক সুবিধা হইতে পারে। কোন অস্থি স্থানচ্যুত বা ভগ্ন হইলে এই জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনেক সময়ে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। ভগ্নচিকিৎসায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ লিখিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শিশু পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।

শিশু কাঁদিলেই যে তাহাকে খাওয়াইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। শিশুকে এরূপ অভ্যাস করান অত্যন্ত অনিষ্টকর। অনেক সময় শিশু তৃষ্ণাজন্য কিংবা পেট ব্যাথা অথবা অন্য কোন শারীরিক কষ্টের জন্য কাঁদে, মাতা তাহা বুঝিয়া চলিবেন। শিশুর সকল ক্রন্দনই যে ক্ষুধার জন্য তাহা নহে।

শিশুকে ঘড়ি ধরিয়া খাওয়াইলে আর তাহার অতিরিক্ত আহারের ভয় থাকে না। ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ একই সময়ে শিশুকে আহার করান কর্ত্তব্য। শিশুর আহার—কলের মত একই সময়ে হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রত্যেক আহার্য্যই ভালরূপে হজম হইবার সময় পাইবে। শিশুকে ধীরে ধীরে আহার করাইবে। তাড়াতাড়ি করিবে না। একবার আহার করিতে যেন দশ হইতে কুড়ি মিনিট সময় লাগে। শিশু তাড়াতাড়ি আহার করিতে চাহিলেও একটু খাওয়াইয়াই বোতল মুখ হইতে বাহির করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে দিবে, তারপর আবার খাওয়াইবে। শিশুকে খুব বেশী গরম কিংবা বেশী ঠাণ্ডা দুধ দিবে না। কখনো তাহাকে খালি বোতলের টিট চুষিতে দিবে না, তাহা হইলে পেটে বাতাস যাইবে, পেট ফাঁপিবে।

শিশুর প্রত্যেক আহারের পরই তাহাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া তাহার পিঠ আস্তে আস্তে চাপড়াইবে, যে পর্য্যন্ত না ঢেঁকুর তুলে। আহারের পর ঢেঁকুর তুলিলে শিশুর সুনিদ্রা হইবে। শিশুকে কোলে শোয়াইয়া যেমন করিয়া মাতৃ-দুগ্ধ পান করাইতে হয়, বোতলে করিয়া দুধ খাওয়াইবার সময়ও ঐরূপে

শিশুকে কোলে শোয়াইয়া খাওয়াইবে। কখনও শিশুর পার্শ্বে দুধের বোতল রাখিয়া কার্য্যান্তরে যাইবে না। শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া তবে অন্য কাজে যাইবে।

প্রথম দশ বৎসর শিশুর শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ দিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে শিশুর দেহ খুব তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। এই কয়েক বৎসরের খাদ্যের উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাস্থ্য, কার্য্যক্ষমতা বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে এবং এই কাল মধ্যে শিশুর নৈতিক শিক্ষা যেরূপ হইবে, ভবিষ্যতে সে সেইরূপ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। সুতরাং প্রথম দশ বৎসর শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিবে, তেমনি তাহার চরিত্র গঠনের দিকেও সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী হইতে হইবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, সাধু-সন্তান লাভ করিয়া জননী ও জন্মভূমি কৃতার্থমনা হইবেন।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে শিশুকে গাভী-দুগ্ধ কিংবা অন্য কোন কৃত্রিম দুগ্ধে বর্দ্ধিত করিতে হয়। তাহা হইলে ইহার সহিত কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানার রস শিশুকে দেওয়া উচিত। Keplar's Codliver oil with malt water bury's Codliver oil এই দুইটি ঔষধটি দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কৃত্রিম দুগ্ধ খাইয়া যে সব শিশু বাড়িয়া উঠে, তাহারা স্বভাবতঃই তেমন সবল হইতে পারে না। তাহাদের পক্ষে এই ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। দুইবার আহারের পর এক চা-চামচ ঔষধ লইয়া দুধে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাওয়ান উচিত।

শিশুর আহার্য্য এক ঘেয়ে হইবে না, মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, তাহা হইলে আহারে রুচি এবং ক্ষুধাও হইবে। শিশুকে কখনও গুরুপাক খাদ্য দিবে না, সর্ব্বদা লঘু, সহজপাচ্য, পুষ্টিকর আহার্য্য দিবে। শিশু ও বালকবালিকাদিগকে কখনও hard boiled ডিম, বাজারের মিষ্টান্ন, মসলাযুক্ত তরকারি, মাংস ও মাছ, নোনা মাছ, মাংস, কেক, পুডিং, নানারকম ফল খাইতে দিবে না। বালকবালিকাকে মিষ্টান্নের মধ্যে সন্দেশ, রসগোল্লা এবং ফলের মধ্যে মিষ্ট আম, কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানা দেওয়া যাইতে পারে। ৫।৬ মাসের হইলেই শিশুদিগকে এই সব ফলের রস দিলে বেশ উপকার দেখা যায়। তাহাদিগকে কখনও চা, কফি কিংবা কোন রকম উত্তেজক পানীয় দিবে না, ইহা তাহাদের পক্ষে বিষতুল্য।

শিশুর বোতলে দুধ খাওয়া অভ্যাস হইয়া থাকিলে—তের মাস কি প'নের মাসের হইলে বোতল ছাড়াইয়া বাটি কিংবা গ্লাস হইতে দুধ খাওয়ান অভ্যাস করিবে। শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দশমাস বয়স পর্য্যন্ত দিবে। তা'রপর ক্রমে ক্রমে ছাড়াইয়া লইবে। মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়ও একবার বোতলে কিংবা বাটী বা গ্লাসে করিয়া গাভীর দুগ্ধ খাওয়ান অভ্যাস করান ভাল। তাহা হইলে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ সহজেই ছাড়াইতে পারা যাইবে।

শিশুদের তিন প্রকারে দুধ খাওয়ান হয়।

(১) অধিকাংশ শিশুই মাতৃদুগ্ধ পান করে।

(২) মাতার দুগ্ধ—পরিমাণে কম কিংবা তেমন পুষ্টিকর হয় না বলিয়া অনেক সময়

শিশুকে মাতার দুগ্ধ এবং গাভী কিংবা অন্ত কোন কৃত্রিম দুগ্ধ দিতে হয়।

(৩) কোন কোন শিশুকে দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল কৃত্রিম দুগ্ধেই বাঁচাইতে হয়। কৃত্রিম দুগ্ধে যে সব শিশুকে পালন করিতে হয়, তাহাদিগকে অতি সাবধানে, যত্নের সহিত, সর্ব্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া, অতিশয় পরিচ্ছন্নতা পূর্ব্বক পালন করিতে হয়। নিয়মের একটুকু ব্যতিক্রম হইলেই এই সব শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নতুবা চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া বাড়িয়া উঠে। এই সব শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধের সহিত ফলের রস, বলকারক ঔষধ, পুষ্টিকারক খাদ্য দিতে হয়। সাধ্যায়ত্ত হইলে ইহাদিগকে স্বাস্থ্যকর দেশে কয়েক বৎসর রাখা উচিত। সহর হইতে অধিক দিন দূরে থাকাই এমন সব শিশুদের পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ সহরের বাহিরে পরিষ্কার নির্ম্মল বাতাস এবং খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া যায়।

এক বৎসর হইলেই শিশুদিগকে solid খাদ্য দেওয়া দরকার। দিনের মধ্যে এক বার দুগ্ধের সহিত এইরূপ খাদ্য দিবে। অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম, রুটি, মাখন দেওয়া যাইতে পারে। দুই বৎসর হইলে ভাত, গাওয়া ঘি, মসুর ডাল এবং আলু খাইতে দিবে। ইহা বেশ পুষ্টিকর আহার্য্য। এই আহার্য্যের মধ্যে আমাদের দেহরক্ষার জন্য যে চারিটী উপকরণ প্রয়োজন—তাহার সকলই বিদ্যমান আছে। ভাত ও আলুর মধ্যে শ্বেতসার এবং ঘিতে মেদ আছে। শ্বেতসার ও মেদ দেহের তাপ উৎপন্ন এবং শক্তি সঞ্চার করে। ডালের মধ্যে nitrogen আছে, তাহা আমাদের দেহের ক্ষয়পূরণ করে এবং মাংস গঠন করে। মসুর ডালে মাংস অপেক্ষা নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী আছে। সুতরাং শিশুদিগকে মাংস না দিয়া মসুর ডাল-ঘি দিয়া দিলেই মাংসের কার্য্য সম্পূর্ণরূপেই সাধিত হয়। সকলপ্রকার ডালই নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্য। দুর্ব্বল শিশুকে মুগ ও মসুর ডালের ঝোল দিলে উপকার হয়।

স্নান।

শিশুকে প্রত্যহ সরিষার তৈল এক ঘণ্টা ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিয়া গরম জল ও ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া স্নান করাইবে। সুস্থ শিশুর প্রত্যহ স্নান আবশ্যক। দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকেও ক্রমে ক্রমে স্নান অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এইরূপ শিশুর স্নান অভ্যাস হইলে ক্রমে সুস্থ হইবে। অগ্নিতে জল গরম করা অপেক্ষা রৌদ্রে জল গরম করিয়া শিশুকে স্নান করাইলে উপকার হয়। নবজাত দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকে স্নানের জলে একটু বিটলবণ, এক আউন্স ব্রাণ্ডি কিংবা এক আউন্স টয়লেট ভনিগার দিয়া স্নান করাইলে তাহার দেহের বল হয়। স্নান অভ্যাস হইলে দুর্ব্বল শিশু ক্রমে বল পাইবে। অতএব যে রকমে হউক শিশুকে স্নান করান অভ্যাস করাইবে। দুর্ব্বল শিশুকে স্নান করাইবার পূর্ব্বে ঘরের দরজা-জানালা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া স্নান করাইবে। স্নান করাইবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে শিশুর নিউমোনিয়া হইবার সম্ভাবনা। শিশুর স্নান অতি শীঘ্র শেষ করিয়া তখনি গামছা দিয়া খুব ভাল করিয়া গা মুছাইয়া একটী জামা গায়ে দিয়া দিবে। সাবান যত কম ব্যবহার করা যায়—ততই

ভাল। সাবান ব্যবহার করিলে শিশুর জন্য গন্ধবিহীন উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবে। Castile, Cuticura সাবান শিশুর পক্ষে উপযোগী। শিশুর মুখে কখনও সাবান দিবে না। তবে দেহ ও মাথা ময়লা হইলে সপ্তাহে একদিন সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবার পর Fuller's Garth, Talc Powder পাউডার শিশুর গায়ে অল্প অল্প ছড়াইয়া দিবে, তাহা হইলে শীঘ্র জল শুষিয়া লইবে, আর গরমের দিনে ঘামাচি হইলেও ইহাতে উপকার হয়। তৈল মাখিয়া স্নানের পর কখনো পাউডার দিবে না। উহাতে লোমকূপ বন্ধ হইয়া যাইবে। শিশুর মুখ দুধের সর দিয়া পরিষ্কার করিবে। বড় হইলেও মুখে সর দিবে, তাহা হইলে মুখ কোমল ও মসৃণ থাকিবে। স্নান করাইবার সময় শিশুর দাঁত, মুখের ভিতর, জিহ্বা, চোখ, নাক বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। আহারের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে কখনও স্নান করাইবে না, অনন্তর দেড় ঘণ্টার পর স্নান করাইবে। দুর্ব্বল শিশুকে প্রথম প্রথম গরম জলে গামছা ভিজাইয়া খুব তাড়াতাড়ি গা মুছাইয়া তখনি আর একখানি শুষ্ক গামছা দিয়া মুছাইয়া দিবে। এইরূপ করিতে করিতে শিশুর স্নান অভ্যাস হইবে।

নিদ্রা।

নবজাত শিশু আহার এবং স্নানের সময় ব্যতীত অন্য সব সময় নিদ্রা যাইবে। শিশু যত ঘুমাইবে তত তাহার ক্ষুদ্র দেহ শীঘ্র গড়িয়া উঠিবে। শিশুর ঘুম কম হইলেই বুঝিতে হইবে—তাহার কোন পীড়া হইয়াছে, তখনি উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে। শিশু এক মাসের হইলে রাত্রে ঘুমাইবার সময়ের পূর্ব্বে একঘণ্টা জাগাইয়া রাখা ভাল, তাহা হইলে রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইবে এবং মাতাকেও রাত্রিতে সে বিরক্ত করিবে না। দুই মাসের হইলে দিনে কয়েক বার এক একঘণ্টা করিয়া জাগিতে পারে। এক মাস বয়স হইলেই মাতা শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় নিজের শয্যায় চুপ করিয়া থাকিতে শিক্ষা দিবেন। শিশু জাগিলেই যে তাহাকে বিছানা হইতে তুলিয়া কোলে করিয়া বেড়াইতে হইবে কিংবা যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে কোন রকম খেলা অথবা আমোদ দিতে হইবে—এরূপ অভ্যাস করান অত্যন্ত অন্যায়। ইহার ফলভোগ মাতাকেই করিতে হয়। এরূপ মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে প্রত্যেক কর্ম্মব্যস্ত মাতাকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং জন্মের পর হইতেই মাতা শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় আপন শয্যায় চুপ করিয়া শোয়াইয়া খেলা করিতে অভ্যাস করাইবেন।

ছয় মাসের হইলে শিশু দিনে ৩।৪ ঘণ্টা ঘুমাইবে এবং সন্ধ্যা ৬॥ টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা কিংবা ৭টা পর্য্যন্ত ঘুমাইবে, মধ্যে রাত্রি ১০ টায় একবার আহারের জন্য তাহাকে উঠান হইবে। ইহার কম নিদ্রা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোনো পীড়া হইয়াছে। এক বৎসরের হইলে শিশু দিবাভাগে দুই ঘণ্টা ঘুমাইবে। ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে দিনে দুই ঘণ্টা করিয়া ঘুমাইতে দিবে। এই দিবাভাগের নিদ্রা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী। আর সন্ধ্যার প্রারম্ভেই শিশু

যাহাতে নিদ্রা যায়—সেদিকে বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিবে। শিশুকে কখনো অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিতে দিবে না। সুনিদ্রা এবং সুন্দররূপে গঠিত মন এক সঙ্গে চলে। একটি আর একটির উপর সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিতেছে। মাতার এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, বিদ্যা-লয়ের বালক বালিকারা যেন কখনো দেরীতে নিদ্রা না যায়। দেহের ন্যায় মস্তিষ্কও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। মস্তিষ্কেরও বিশ্রাম চাই। সুতরাং এটি জানা উচিত যে, ঘুমের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মস্তিষ্ক যেন বিশ্রাম না করে।

শিশুকে কখনো মাতার সহিত এক শয্যায় শোয়াইবে না। প্রথম হইতেই তাহার জন্য পৃথক একটি রেলিং দেওয়া খাটে তাহাকে শয়ন করাইবে। কারণ মাতার সহিত একত্রে শুইলে,—

(১) মাতা ঘুমন্ত অবস্থায় তাহার উপর আসিয়া পড়িলে শিশুর শ্বাস রোধ হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শীতকালে মাতার গায়ের লেপ শিশুর উপর পড়িয়া শিশুর শ্বাসরোধে মৃত্যু হইয়াছে এরূপ দুর্ঘটনার কথাও জানি—ইহাও উল্লেখ করিতে পারি।

(২) মাতার ফুসফুস হইতে যে বিষাক্ত বায়ু (কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস) প্রশ্বাস রূপে বহির্গত হয় তাহা শিশু নিশ্বাস দ্বারা টানিয়া লয়।

(৩) মাতার গায়ের কাপড় শিশুর মুখের উপর ঢাকা পড়িতে পারে। শিশু তাহা হইলে কাপড়ের নীচের দূষিত বায়ুই কেবল শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে থাকে।

(৪) গরমের দিনে মাতার গরম দেহের সংস্পর্শে শিশুর দেহ গরম হইয়া উঠিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইতে পারে। ঘর্ম্মাক্ত দেহে ঠাণ্ডা লাগিবার অধিকতর সম্ভাবনা।

(৫) রাত্রিতে মাতার সহিত শুইলে, দিনে কখনো নিজের শয্যায় শিশু শুইতে চাহিবে না।

শিশুকে কখনও কোলে করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া ঘুম পাড়ান অভ্যাস করিবে না। নিদ্রার সময় হইলে শিশুকে তাহার খাটে শোয়াইয়া দিবে এবং সে যাহাতে নিজের শয্যায় শুইয়া থাকিতে থাকিতেই ঘুমাইয়া পড়ে, এইরূপ অভ্যাস করাইবে। প্রথম প্রথম এইরূপে ঘুমাইবার সময় খুব কাঁদিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে না। দিন কয়েক কাঁদিয়া যখন সে দেখিবে যে কাঁদিলেও কেহ তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়না, তখন আপনা হইতেই সে চুপ করিয়া যাইবে এবং নিজের শয্যাতেই ঘুমাইয়া পড়িবে।

পরিচ্ছদ।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শিশুর পরি-চ্ছদের প্রতি তত মনোযোগ দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ সূতিকা গৃহের একমাসকাল শিশুকে সামান্য ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া মুড়িয়া রাখা হয়। সুস্থ, সবল, শিশুর পক্ষে এরূপ ব্যবস্থায় প্রায় কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু দুর্ব্বল, রুগ্ন শিশুকে শুধু ন্যাকড়ায় মুড়িয়া রাখিলে তাহার পক্ষে নানারূপ ফুসফুসের পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় সবল শিশুও অনুপযুক্ত বস্ত্রের জন্য ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। আবার অধিক বস্ত্রে সর্ব্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও শিশু বাড়িতে পারে না এবং দেহ দুর্ব্বল হয় সুতরাং কখনো অল্প বস্ত্র গায়ে থাকিলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল শিশুর দৈহিক যন্ত্রাদিও দুর্ব্বল থাকে, এই জন্য অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। প্রথম মাস দুর্ব্বল শিশুর দেহে প্রথমে একটি সাদা বেনিয়ান, তাহার উপর একটি ফ্ল্যানেলের বেনিয়ান পরাইয়া রাখা ভাল। তা'রপর ক্রমে ঠাণ্ডা সহ্য হইলে শুধু সুতার জামা গায়ে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম কালে খালি গায়েই শিশুদের রাখা ভাল। শিশুদিগকে যত শীতাতপ সহ্য করান যাইবে ততই ভবিষ্যতে তাহাদের দেহ দৃঢ় এবং কষ্টসহিষ্ণু হইবে। অতি যত্নে, সর্ব্বদা কেবল পোষাক পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া রাখিলে শিশুর মঙ্গল না হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। এরূপ শিশু ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামে একেবারেই অপটু হয়। দুর্ব্বল শিশুকেও ক্রমে ক্রমে শীতাতপ সহ্য করাইয়া দৃঢ় ও বলশালী করা প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য। দেহ বলশালী ও দৃঢ় হইলে মনও তেজস্বী ও মহৎ হয়। সুতরাং শিশুকে সাজ-পোষাক পরাইয়া কেবল ফুলের মত করিয়া তুলিলে তাহার দ্বারা পৃথিবীতে কোন কাজই হইবে না। শিশুকে দেশের ও সমাজের গণ্য "মানুষ" করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রত্যেক পিতামাতাই দায়ী।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শিশুর গাত্রের উপরেই কখনো ফ্ল্যানেল দেওয়া উচিত নহে। সর্ব্বদা সুতার কাপড় দেওয়া উচিত। শিশুর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয় গুলি মনে রাখিলেই যথেষ্ট।

(১) হাল্‌কা ও ঢিলা।

(২) শীতকালে গরম বস্ত্র চাই।

(৩) সচ্ছিদ্র (Porus)।

(৪) আরাম দায়ক।

(৫) যাহা অতি সহজেই পরাইয়া দেওয়া যায়।

শিশুর জন্মের প্রথম কয়েক মাস মুখ ব্যতীত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখা নিরাপদ জনক এবং প্রথম বৎসর তাহার বুক, পিঠ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া রাখা উচিত। তা'রপর ক্রমে বাতাস ও শৈত্য সহ্য হইলে গরমের সময় খালি গায়ে রাখা যায়। তবে শীতকালে ও শীতপ্রধান দেশে উপযুক্ত বস্ত্র দ্বারা শিশুকে আবৃত করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ শিশুর ফুসফুসে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে—সেদিকে প্রত্যেক মাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ফুসফুস যে কেবল বক্ষঃস্থলেই অবস্থিত তাহা নহে, উপরে collar bone এবং পার্শে armgist পর্য্যন্ত ফুসফুস বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই সব স্থান ও ভাল করিয়া আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নীচু গলা এবং ছোট হাতের গাত্রাবরণ শিশুর ফুসফুসের কিয়দংশ অনাবৃত করিয়া রাখে, সুতরাং এরূপ পরিচ্ছদ শিশুর পক্ষে অনুপযোগী। শিশুর পেটও উপযুক্তরূপে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুর পাকস্থলী, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রাদি এত delicate যে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাদের কার্য্যের বিকৃতি ঘটে। পেটে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই পেটের অসুখ কিংবা কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে। আমা-

দের দেশে শীতের সময় অতি শিশুদের পেটে একটি ফ্ল্যানেলের কিংবা পশমের বেল্ট বাঁধিয়া রাখা ভাল, অন্য সময়ে নহে। বেল্টটি আল্‌গা ভাবে বাঁধিয়া রাখা উচিত। শক্ত করিয়া বাঁধিলে খাদ্য পরিপাক করিতে পারে না। সুতার জামা সহজেই ঘামে ভিজিয়া যায়। ঘামে ভিজিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বদ্‌লাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার উপর বাতাস লাগিলেই শিশুর ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়া হইবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মকালে বরং শিশুকে খালি গায়ে রাখিতে অভ্যাস করান উচিত। তাহা হইলে জামা ঘামে ভিজিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকাল ব্যতীত অন্য সব সময়েই শিশুদের মাথা ও গা খালি রাখা ভাল। মাথায় টুপী ও পায়ে সর্ব্বদা মোজা পরাইয়া রাখিলে শিশুর দেহ সবল হইয়া উঠিতে পারে না। শীতকালে এবং অন্য ঋতুতে খুব ঠাণ্ডা পড়িলে পায়ে মোজা দেওয়া উচিত, কিন্তু অন্য সময়ে খালি পায়েই বেড়াইতে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এদেশে শিশুদের টুপীর প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। শিশুকে যত ধূলা মাটিতে খেলা করিতে, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে অভ্যাস করাইবে ততই তাহার দেহ দৃঢ় হইবে এবং মাতা ও শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গল জনক হইবে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।

(২)

গত বারে আমরা "বাঙ্গালার স্বাস্থ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সরকারি রিপোর্ট হইতে ১৯১৮ খৃঃ অব্দের অবস্থার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালা দেশে জন্ম সংখ্যা যেমন কমিয়া গিয়াছে মৃত্যুসংখ্যা তেমনি যথেষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মৃত্যুর মধ্যে আবার শিশু ও যুবতী মৃত্যুই অধিক। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালাদেশে যত লোক মরিয়াছে, তাহার মধ্যে জ্বর রোগে মরিয়াছে ১৩৷৷০ লক্ষের উপর, কলেরায় মরিয়াছে ৮২ হাজারের উপর এবং আমাশয় ও উদর পাড়ায় মরিয়াছে ২৯ হাজারের উপর। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে সর্ব্বসমেত বাঙ্গালাদেশে সকল প্রকারে লোক মরিয়াছে ১৫ লক্ষ।

দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়ভার বাঙ্গালা দেশের প্রকৃতিপুঞ্জই বহন করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশের প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে যে ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য মাত্র।

আলোচ্য বর্ষে হাওড়া, বহরমপুর, উত্তরপাড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, নাটোর এবং রাজবাড়ী—এই স্থান কয়টিতে পরিষ্কৃত জল সরবরাহের সুব্যবস্থা—স্বাস্থ্যবিভাগ

হইতে করা হইয়াছিল। হাওড়ায় অর্থাভাবে কার্য্যের উন্নতি করা সম্ভবপর হয় নাই। নাটোর ও বহরমপুরে বৃষ্টির জন্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই, ঢাকার এবং রাজবাড়ীর কার্য্যও শেষ করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। ময়মনসিংহ এবং সাতক্ষীরার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার কথা বলিতে হইলে আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র উত্তর পাড়ার কার্য্যটিই সুসম্পন্ন হইয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গালাদেশে এই জল সরবরাহ ব্যাপারে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ৩,০৬,৮৮৬ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণ-ব্যপদেশে ৭১,০৯৮ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত জল সরবরাহ ও পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ—এই উভয় কার্য্য ১৯১৮ খৃঃ অব্দে মোট ৩,৭৭৯৮৪ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। যে দেশে এক বৎসরে মৃত্যু সংখ্যা ১৫ লক্ষ, সে দেশে চারি লক্ষেরও কম টাকা স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ব্যয় করা কতদূর উপযুক্ত, তাহার মীমাংসা দেশের চিন্তাশীলগণ করিবেন।

হাওড়ায় অর্থাভাবে কার্য্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই, অথচ মেডিকেল কলেজের ধাত্রী-দিগের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৬ লক্ষ টাকা বজটে মঞ্জুর করা হইয়াছে। রেলওয়ে বিভাগ ও সৈন্য বিভাগের খরচের তালিকাও অন্যান্য বারের মত বাড়িয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই সমগ্র বঙ্গে ৩॥০ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে—ইহা স্বাস্থ্য কমিশনার মহোদয়ের রিপোর্টেই প্রকাশ, কিন্তু এই ভীষণ মারাত্মক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা রিপোর্টে নাই। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে যত্ন লইয়াছিলেন সত্য, মফঃস্বলের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিও এজন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতেও ইহার কিছু ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশের মৃত্যুবৃদ্ধির কারণ উপলক্ষ করিয়া ডাঃ বেণ্টলী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, খাদ্যা-ভাবেই দেশের মৃত্যু সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিশু মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশেও তিনি শিশু-জননীদিগের খাদ্যাভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তো এ কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। লোকের পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়াছে, সাধারণ গৃহস্থকে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার উপর অধুনা দেশে সকল জিনিসই যেরূপ দুর্ম্মূল্য এবং নানারূপে ব্যয়ের মাত্রা যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সারাদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমলব্ধ অর্থেও লোকের স্বচ্ছলতার সহিত সংকুলান হওয়া কঠিন ব্যাপার। কাজেই বাঙ্গালার দারিদ্র্য ক্রমশঃই ভীষণভাব ধারণ করিতেছে। বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। উপযুক্ত পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণে সমর্থ হয় না, দুগ্ধ ঘৃতাদি পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর আর বল বৃদ্ধির উপায় নাই, তাহার উপর বাঙ্গালীর যেটুকু শক্তিসামর্থ্য আছে, নানা কারণে তাহারও অপচয় ঘটিতেছে,—ইহারই ফলে বাঙ্গালী-শরীরে সকল প্রকার রোগই

অতি সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে এবং তাহার পরিণতিই হইতেছে বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু।

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ায় প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় সত্য, কিন্তু সেই অনুপাতে শিশু মৃত্যু এবং যক্ষ্মায় মৃত্যু ও তো বড় কম নহে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে যে সমগ্র বঙ্গে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ৩॥০ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ প্রাণত্যাগ করিল—ইহারই বা কারণ কি? মানবের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত পৃথ্বী রোগশূন্যা হইতে পারে না, জন্মগ্রহণ করিলেই মানবকে রোগের জ্বালা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেই মানুষ মরিবে কেন? অন্যান্য দেশেও তো রোগ হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশের লোক বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদিগের মত এত মরে না কেন? অন্যান্য দেশের লোকের রোগ হয়, চিকিৎসা হয়, তাহারা আরোগ্য লাভ করে। যাহার নিয়তি ফুরাইয়া থাকে, সেই কেবল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যত লোক রোগগ্রস্ত হয়, তাহার অধিকাংশই মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, ইহার প্রধান কারণই হইতেছে, পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবে এবং নানারূপ অত্যাচারে, তাহার উপর একটি না একটি ব্যাধিতে ক্রমাগত ভুগিয়া বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি এরূপ কমিয়া গিয়াছে যে, সেই ক্ষয়প্রাপ্ত জীবনীশক্তি রোগের আক্রমণ মোটেই সহ্য করিতে পারে না, কাজেই অতি সহজেই ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত করে। বাঙ্গালীজাতির ধ্বংস হইতেছে এইরূপে।

বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদিগকে মৃত্যুর আধিক্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ডাঃ বেণ্টলী সাহেব গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার ও কয়েকজন করিয়া তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐরূপ নিযুক্তির ফলে কয়েকজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইন বিতরণের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেইতো চলিবে না, পল্লীর পানীয় জলের সুব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। যে সব গ্রামে বিশেষ জলকষ্ট, সে সব গ্রামে সর্ব্বাগ্রে পুষ্করিণী বা ইঁদারা কাটানর ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক গ্রামে হয় তো দু'চারটি পুকুর মান্ধাতার আমলে কাটান হইয়াছিল, বহুকালাবধি সংস্কারের অভাবে সেগুলি বুজিয়া যাইবার মত হইয়াছে, সেগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা জানি, এইরূপ সংস্কারের প্রয়োজন হইলে পুষ্করিণীর অধিকারীকে বা গ্রামের অধিবাসীদিগকে চাঁদা তুলিয়া কতক টাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হস্তে প্রদান করিতে হয়, তবে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড তাহার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু দারিদ্র্যই যখন বাঙ্গালায় রোগ বৃদ্ধি—তথা মৃত্যু বৃদ্ধির কারণ, তখন দরিদ্র পল্লীবাসীর দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ হওয়া এ সময় সহজ ব্যাপার হইবে না। কাজেই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে মহামান্য সরকার বাহাদুরকে এ বিষয়ের ভার অনেকস্থলে নিজেই লইতে হইবে। পল্লীর কৃতী সন্তানদিগেরও অবশ্য এ বিষয়ে সাধ্যমত সহায়তা করা কর্ত্তব্য। ফল কথা পল্লীগ্রামের জল সংস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত পল্লী রক্ষার যে উপায় হইবে না—ইহা সুনিশ্চয়।

সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যেরআবশ্যকতা আছে কি না?

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

তামাক।

তামাক মাদক দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। যাহারা তামাক খাইতে অভ্যস্ত তামাকের ধূমপান করিলে তাহাদের মত্ততা জন্মে না বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি কখন তামাক খায় নাই, তাহার মত্ততা জন্মিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তামাক সভ্যজগতে প্রচলিত ছিল না। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার কালে তাঁহার সঙ্গী সার্ ওয়ালটার র‍্যালে দুইটী দ্রব্য আমেরিকা হইতে য়ুরোপে লইয়া আসেন, একটী গোল আলু, অপরটী তামাক।

কোন কোন লেখক তামাক পূর্ব্বে এদেশে ছিল এইরূপ প্রমাণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে যে ধূমপানের উল্লেখ আছে তাহা তামাকের ধূম নহে। বিবিধ ঔষধ একত্র করিয়া তাহার ধূম পান করিতে হয় এবং এইরূপ ধূমপান বিবিধ রোগনাশক ইহাই আয়ুর্ব্বেদের কথা। তামাক সম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্লোক অল্পদিন হইল রচিত এবং গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। তামাক সম্বন্ধে এক্ষণে যতগুলি শ্লোকই শুনা যায়, সবগুলিই আধুনিক রচিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তামাক ধনী, দরিদ্র পণ্ডিত, মূর্খ, ত্যাগী, ভোগী নরনারী সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে এই সর্ব্বজন সমাদৃত তামাক সেবনের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। রুসিয়া দেশে তামাক সেবনের প্রথম অপরাধে ভীষণ বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় অপরাধে নাসিকা ছেদন এবং তৃতীয় অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু অবশেষে মনুষ্যের মাদক দ্রব্য সেবনের কুপ্রবৃত্তিই জয়লাভ করায় সে সব ব্যবস্থা সে দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এখনকার দিনে মদ্য খাদ্য স্থানীয় কি না—এ প্রশ্ন বরং উত্থাপিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তামাক সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এখনকার দিনে সাধারণতঃ অনেক লোকেই তামাকের ধূমই পান করে। যাহারা দোক্তা, সুথা, নস্য প্রভৃতি ব্যবহার করে, তামাকের বীর্য্য মাত্র তাহাদের শরীরে প্রবেশ করে, সুতরাং তামাক খাদ্য নহে।

তামাক যে সুস্থ শরীরে বিষের ন্যায় অপকারী তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে ব্যক্তি কখন তামাক খায় নাই তাহাকে তামাক খাইতে দিলে তাহার মাথার যন্ত্রণা, বমনভাব বা বমি, মত্ততা এবং শরীর যেন ঘুরিতে থাকে এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। যে দ্রব্য মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ বিকার উৎপাদন করিতে সক্ষম, সেই দ্রব্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে শরীরের যে বিষম অনিষ্ট করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?